নূরুল কুরআন

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নূরুল কুরআন

(আল কুরআনের জ্যোতি)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

একটি খিলাফত জুবিলী প্রকাশনা

প্রকাশক | **মাহবুব হোসেন**
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভাষান্তর | মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমিন
মুরব্বী সিলসিলাহ্

প্রথম প্রকাশ | বাংলা, ২৭শে মে ২০০৮ ইং
সংখ্যা | ২০০০ কপি

মুদ্রণে | **বাড-ঔ-লিভস্**
২১৭/এ, ফকিরেরপুল ১ম লেন
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Noorul Quran | Published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

মুখবন্ধ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) "নূরুল কুরআন" পুস্তকটি উর্দুতে লিখেন। এটি সাময়িকী রূপে দুই খন্ডে উর্দুতে প্রকাশিত হয়। প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সনে, এ পুস্তকটি উক্ত খন্ডের বাংলায় অনুদিত ১ম সংস্করণ।

এ পুস্তকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ প্রদত্ত ঐশী ও জীবন্ত কিতাবের কি বৈশিষ্ট্যাবলী থাকা উচিত এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। কুরআন শরীফ আল্লাহ্ প্রদত্ত ঐশী ও জীবন্ত কিতাব এ প্রসঙ্গে যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরেন। পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের-বিশেষ করে হিন্দু ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদেরকে তাদের কিতাব বেদ ও ইঞ্জিলের সপক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

এ পুস্তকে তিনি প্রায়শ্চিত্তবাদ ও মূর্তিপূজার বিষয়ে আলোকপাত করেন। ঐতিহাসিক চমকপ্রদ তথ্যের আলোকে দেখান–আরবরা প্রকৃতিগতভাবে মন্দ চালচলনে নিমজ্জিত জাতি ছিল না। বরং প্রায়শ্চিত্তবাদের মন্দ ও ভ্রান্ত শিক্ষাই আরবদেরকে মন্দ কাজে উৎসাহিত ও বেপরোয়া করে দিয়েছিল। আরবরা মদের ব্যবহার জানতো না। সর্ব প্রথম খ্রিষ্টানরা এটা আরবে নিয়ে এসেছিল। অপর দিকে খ্রিষ্টানদের যিশু খৃষ্টের পূজার ধ্যান-ধারণা আরবদের মূর্তিপূজার ধ্যান-ধারণাকে আরও শক্তি যুগিয়েছিল।

এ ছাড়াও তিনি এ পুস্তকে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে এ বিষয়টি জোরালোভাবে সাব্যস্ত করেন–ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস মূলত: হিন্দুদের ত্রিমূর্তির বিশ্বাসের নকল। অনুরূপভাবে যিশু খৃষ্টকে ঈশ্বর বানানোর ক্ষেত্রেও খ্রিষ্টানরা গ্রীক ও হিন্দুদের বিশ্বাসেরই নকল করেছে। এ রকম বহুবিদ বিষয় এ পুস্তকে আলোচিত হয়েছে।

খিলাফতে আহমদীয়ার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বাংলা ভাষায় **'নূরুল কুরআন'** পুস্তকটির প্রথম খন্ডের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই

আনন্দিত। আলহামদুলিল্লাহ্। আশা করি, পাঠকগণ এথেকে উপকৃত হবেন। এ পুস্তকটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমিন, শিক্ষক জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। অনুবাদটি প্রাথমিকভাবে দেখে দিয়েছেন- এডঃ ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব। পরে মূল উর্দুর সাথে মিলিয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন, মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। অনুবাদটি জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তা'লিমও দেখেছেন ও প্রয়োজনীয় অলংকরণের কাজ করেছেন। এছাড়াও আরও যাঁরা এ পুস্তকের কাজে সহযোগিতা করেছেন মহান আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দিন।

খাকসার

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

লেখক পরিচিতি

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের উপর নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের ভাগ্যের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অসংখ্য লেখা (প্রায় ৮৮টি পুস্তক) বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এর বিশ্বাসসমূহকে অবলম্বনের মাধ্যমেই কেবল মানবকূল তার সৃষ্টিকর্তা প্রকৃত খোদার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। কুরআন-এর শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের প্রচারিত রীতি-নীতিই কেবল মানব জাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে

পারে। তিনি ঘোষণা করেন- কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহতা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে একত্রিত হওয়ার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ১৯৩ টি দেশ জুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের পর হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল প্রথম খলিফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল-এর মৃত্যুর পর প্রতিশ্রুত মসীহ্র (আ.) প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলিফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয় এবং তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলিফা নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল ২০০৩ সন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বে পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ খামেস বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দান করছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর প্রপৌত্র হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী।

সূচী পত্র

(যে বিষয়গুলো এ পুস্তকে আলোচিত হয়েছে)

১। কুরআন ঐশী কিতাব হবার দাবী ও প্রমাণ নিজেই দেয় -১
২। ঐশী কিতাবের প্রথম নিদর্শন জ্ঞান দানের শক্তি -১
৩। ধর্মে বল প্রয়োগ বৈধ নয় -২
৪। কুরআন খোদা তাআলার বাণী হওয়ার সপক্ষে দলিল -৩
৫। বেদের ঐশী কিতাব হবার দাবী নেই -৬
৬। ঐশী সংস্কারক ও কিতাবের কখন আসা প্রয়োজন -৬
৭। রসূল (সা.) সব জাতির জন্য আগমন করেন -৭
৮। কুরআন অবর্তীণের যুগের বর্ণনা -৮
৯। জীবন্ত সমাধীস্ত মেয়েদের সম্পর্কে কিয়ামতে
জবাবদিহি করতে হবে -৮
১০। মৃত পৃথিবীকে জীবিত করেছে কুরআন -৯
১১। এক বহিরাগত মন্দ জাতির কারণে আরবে মন্দ
চালচলন ছড়িয়েছে -১২
১২। মন্দ কর্মে ইহুদীদের চেয়ে খ্রিষ্টানরা অগ্রগন্য ছিল -১৩
১৩। প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাসের কারণে খ্রিষ্টানরা মন্দ কর্মে অগ্রগন্য ছিল -১৩
১৪। মদ তৈরী হযরত ইসা (আ.) এর মোমেযা -১৩
১৫। পাপ থেকে বেঁচে থাকার তিনটি কারণ -১৪
১৬। খ্রিষ্টানদের অসভ্য ও হিংস্র অত্যাচার -১৪
১৭। শাসন ক্ষমতা ও সম্পদ খ্রিষ্টানদেরকে মন্দ কর্মে বেপরোয়া করে দেয় -১৪
১৮। খ্রিষ্টানদের মন্দ কর্মে আরবরা প্রভাবান্বিত হয় -১৪
১৯। খ্রিষ্টান কবি আখতালের কবিতা -১৫
২০। প্রাচীন খ্রিষ্টানদের মন্দ চালচলনেরই ধারাবাহিক বাস্তবায়ন
আজ ইউরোপে হচ্ছে -১৫
২১। মুসলমানরা প্রাচীন কবিদের কাব্যগ্রন্থগুলোকে কখনও নষ্ট করেনি -১৬

২৩। অন্ধকার যুগে সূর্যরূপে ইসলামের আত্মপ্রকাশ -১৬
২৪। মিয়া আখতালের কবিতার পঙক্তির আলোকে খৃষ্টীয় সমাজ ব্যবস্থার চিত্র -১৭
২৫। প্রায়শ্চিত্তবাদের শিক্ষা মিথ্যা ও বৃথা প্রবঞ্চা -১৯
২৬। খ্রিষ্টানরা মূর্তিপূজারিদের চেয়েও বেশি অধপতনে নিমোজ্জিত -১৯
২৭। আপন মায়ের প্রতিও খ্রিষ্টানরা প্রেমাসক্ত ছিল -২০
২৮। যিশু খৃষ্টের পূজা মূর্তিপূজার ধ্যান ধারনাকে শক্তি যুগিয়েছে -২১
২৯। মদ সব অনিষ্টের মূল -২১
৩০। পাঁচ বেলার মদের জায়গায় পাঁচ ওয়াক্তের নামায স্থান লাভ -২১
৩১। লন্ডনের সব মদের দোকানকে একত্রে সাজালে৭৫ মাইল দৈর্ঘ্য হবে -২১
৩২। মুসলমানদের যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষা মূলক -২২
৩৩। খ্রিষ্টানরা মানুষকে খোদার পুত্র বানিয়েছে -২২
৩৪। যিশু খোদা হিসেবে বিশেষ কোন কাজ করেন নি -২২
৩৫। মৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে রাত জেগে যিশুর দোয়া -২২
৩৬। পরিপূর্ণ কিতাব কুরআন যাদের জন্য নাযেল হয়েছে
তাদেরও পূর্ণতা লাভ হয়েছে -২২
৩৭। ইস্তেগফারের আসল রহস্য -২৪-২৭
৩৮। রসূল (সা.) কে সবচে বেশি প্রয়োজনের সময়
প্রেরণ করা হয়েছিল -২৭
৩৯। কেউই নিজেদের মন্দ কর্ম স্বীকার করতে চায় না -২৭-২৮
৪০। খ্রিষ্টানরা শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের ইশ্বরত্বকে স্বীকার করে না -২৮
৪১। হিন্দুরা মরিয়ম পুত্রের ইশ্বরত্বকে স্বীকার করে না -২৮
৪২। মানুষকে সর্ব প্রথম হিন্দু ও গ্রীকরা ইশ্বর বানায় -২৯
৪৩। খোদার পুত্র শব্দ বাইবেলে যিশু ছাড়াও অনেকের জন্য
ব্যবহৃত হয়েছে -২৯
৪৪। ত্রিত্ববাদ হিন্দুদের বিশ্বাসকে নকল করে করা হয়েছে -৩০
৪৫। হিন্দুদের মধ্যে ত্রিত্ববাদের অনুরূপ ত্রিমূর্তির বিশ্বাস রয়েছে -৩০
৪৬। গ্রীক ও ভারতবর্ষের ধ্যান ধারণার সামঞ্জস্যতা -৩১
৪৭। ত্রিত্ববাদ প্লেটোর এক ভুল চিন্তার অনুসরণের ফসল -৩১

৪৮। আকাশ ও পৃথিবী এক প্রকৃত খোদার মহিমা গেয়ে যাচ্ছে -৩২
৪৯। আঁ হযরত (সা.) মন্দের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত এক জাতিকে সংশোধন করেছেন -৩৩
৫০। মদ সব মন্দ কর্মের জননী -৩৩
৫১। সত্য নবীর সত্যতার লক্ষণ তাঁর সংস্কার ও সংশোধন ব্যাবস্থায় ফুট উঠে -৩৩
৫২। যায়েদের আত্মহত্যায় বকরের কি উপকার -৩৪
৫৩। অন্যের কল্যাণার্থে প্রাণ বিসর্জন দেয়া ভাল কাজ কিন্তু আত্ম হত্যা নয় -৩৫
৫৪। 'হুজ্জাতুল বিদা'তে বক্তব্য প্রদান -৩৫
৫৫। রসূল (সা.) এর আগমন অতি প্রয়োজনের সময় হয়েছে -৩৬
৫৬। প্রত্যাগমন হয়েছে প্রয়োজন পুরো করার পর -৩৬
৫৭। প্রায়শ্চিত্তবাদই খ্রিষ্টানদেরকে মন্দ কর্মে নিমোজ্জিত হতে সহায়তা করেছে -৩৬
৫৮। সত্যবাদী নবীর সত্যতার লক্ষণ হলো তিনি সংশোধনের এক বড় দৃষ্টান্ত দেখাবেন -৩৭
৫৯। যিশুর ১২ জন হাওয়ারীর কর্মকান্ড -৩৭
৬০। এক হাওয়ারী ৩০ টাকায় যিশুকে (আ.) ঘাতকের হাতে তুলে দেয় -৩৭
৬১। ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদ পৌলের চালাকীর ফসল -৩৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

অবতারণা

বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত চিন্তাভাবনা যেহেতু এ যুগে প্রত্যেক জাতির মাঝে এমনভাবে প্রসার লাভ করছে যার মন্দ প্রভাব সাধারণ লোকদেরকে মৃত্যুমুখে নিপতিত করে দিচ্ছে, বিশেষ করে যাদের মাঝে ধর্মীয় দর্শনের পরিপূর্ণ চিত্র নেই। অথবা এমন অস্পষ্টভাবে আছে যা কল্পবাদী দার্শনিকদের অলীক চিন্তা অতি সহজে মিটিয়ে দিতে পারে। এজন্য আমি যুগের বর্তমান অবস্থার প্রতি সদয় চিত্ত হয়ে এই বিষয়গুলো এ মাসিক সাময়িকীতে প্রকাশ করতে যাচ্ছি, যা ঐ সমস্যার যথাযথ সমাধান দিবে। এটা সঠিক পথকে জানার, বুঝার ও সনাক্ত করার মাধ্যম হবে। আর এটা থেকে তারা সত্য দর্শন বুঝতে পারবে, যা হৃদয়কে সান্তনা দেয়, আত্মাকে পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি দেয়, ঈমানকে ইরফানের (তত্ত্বজ্ঞানের) রঙে রঙিন করে দেয়। যেহেতু এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য ঐশী বাণীর তত্ত্বজ্ঞান ও নিগূঢ় রহস্য লোকদের বোধগম্য করানো। তাই এ পুস্তিকায় এই বিষয়টি সর্বদা প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, কোন দাবী ও যুক্তি প্রমাণ নিজের পক্ষ থেকে উপস্থাপন না করে কুরআন করীম থেকে দেয়া হবে, যা খোদার বাণী এবং এ বাণী জগতের অন্ধকার দূরীকরণের জন্য এসেছে। যাতে লোকেরা জানতে পারে একমাত্র কুরআন শরীফেই এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এটা নিজের দাবী ও প্রমাণ নিজেই বর্ণনা করে। কুরআন শরীফ খোদা প্রদত্ত হবার এটাই প্রথম নিদর্শন, কুরআন শরীফ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বদাই নিজের যুক্তি প্রমাণ নিজে উপস্থাপন করে। নিজেই দাবী করে এবং নিজেই দাবীর সপক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে। কুরআন শরীফের দলিল প্রমাণাদি দ্বারা (অন্যকে) পরাস্ত করার এ বৈশিষ্ট্য আমরা এ পুস্তিকায় এজন্য প্রকাশ করতে চাচ্ছি, যেন এর মাধ্যমে সে সব ধর্মও নিরুপিত হয়ে যায় যেগুলোর অনুসারীরা ইসলামের বিপরীতে এমন সব কিতাবের প্রশংসা করছে যেগুলোর নিজের দাবী দলিল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করার কোন সামর্থ্য নেই। এ বিষয়টি অতি স্পষ্ট, **ঐশী কিতাবের প্রথম নিদর্শন হলো জ্ঞানদানের শক্তি।** আর একটি কিতাব বাস্তবিক

অর্থে ইলহামী কিতাব হওয়া সত্ত্বেও কোন সত্য বিষয়, যা আকাঈদ (বিশ্বাস) ও ধর্মীয় প্রয়োজনের বিষয় তা বর্ণনায় অসমর্থ হবে এটা কখনও হতে পারে না। অথবা, মানব রচিত এক কিতাবের বিপরীতে তা অন্ধকার ও ক্ষতির গহ্বরে পড়ে থাকবে (তাও সম্ভব নয়)। বরং ঐশী কিতাবের প্রথম নিদর্শন হলো, যে নবুওয়ত ও বিশ্বাসের ভিত্তি এ (কিতাব) রেখেছে সেটাকে যুক্তিযুক্তভাবে প্রমাণও করবে। আর এ (কিতাব) যদি নিজের দাবীকে প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে এটা মানুষকে গোলক ধাঁধায় ফেলে দিবে। তখন এ ধরণের কিতাবকে মান্য করানোতে বল প্রয়োগ ও জোর জবরদস্তির প্রয়োজন হবে। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট ও অতি সহজবোধ্য, যে কিতাব বাস্তবিকই ঐশী কিতাব হবে সেটা মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে এমন কোন বোঝা চাপিয়ে দেয় না। বা বুদ্ধি বিবেক বর্জিত এমন বিষয়াদি উপস্থাপন করে না, যা গ্রহণ করতে বল প্রয়োগ ও জোর জবরদস্তির প্রয়োজন হয়। কেননা শুভ বুদ্ধি ও জাগ্রত বিবেক সম্পন্ন কোন ব্যক্তি ধর্মে বল প্রয়োগ ও জোর জবরদস্তি বৈধ, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। এ কারণে আল্লাহ জাল্লা শানহু কুরআন করীমে ঘোষণা দিচ্ছেন-

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ

(সূরা বাকারা-২৫৭)

(অনুবাদ-ধর্মের বিষয়ে কোন বল প্রয়োগ নেই)।

ঐশী কিতাব কেমন হওয়া উচিত? এ বিষয়টি আমরা যখন ন্যায়পরায়নতার সাথে চিন্তা করি তখন আমাদের অর্ন্তদৃষ্টি অত্যন্ত জোরালোভাবে সাক্ষ্য দেয়, ঐশী কিতাবের চেহারার প্রকৃত সনাক্তকারী চিহ্নাবলী হচ্ছে, এটা স্ব জ্যোতিতে জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রসমূহে হাক্কুল একীন (অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান) এর রাস্তা নিজেই দেখায় এবং পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এটা ইহজগতেই বেহেশতী জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেয়। কেননা ঐশী কিতাবের একমাত্র জীবন্ত মোযেযা (অলৌকিক নির্দশন) হচ্ছে এটা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সঠিক দর্শনের শিক্ষক। এক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে যে সীমা পর্যন্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের রহস্য জানা সম্ভব, ঐ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান এর মাঝে বিদ্যমান থাকবে। আর এটা শুধুমাত্র দাবীদার হবে না বরং নিজের প্রত্যেক দাবীকে এমন অকাট্যভাবে প্রমাণ করবে যে, এতে পুরোপুরি প্রশান্তি লাভ হবে। যে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির সাথেই এর ওপর দৃষ্টি সম্পাত করা হোক, পরিষ্কার দেখিয়ে দিবে, প্রকৃত পক্ষেই এটা এমন অলৌকিক শক্তি নিজের মাঝে রাখে যে, ধর্মীয় বিষয়ে মানবীয় অন্তর্দৃষ্টিকে

উন্নীত করতে এটা সর্বোচ্চ স্তরের সাহায্যকারী আর নিজের কার্যকলাপের নিজেই তত্ত্বাবধায়ক।

পরিশেষে আমি আমার প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে ঘোষণার মাধ্যমে সম্বোধন করে সতর্ক করছি, যদি তারা বাস্তবিকই নিজের কিতাবকে আল্লাহ্ প্রদত্ত মনে করে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, এটা ঐ পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত, যিনি নিজের পবিত্র কিতাবকে এ ধরনের লজ্জা ও অনুতাপের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করতে চান না যে, তাঁর কিতাব শুধুমাত্র যুক্তি-প্রমাণহীন অনর্থক ও ভিত্তিহীন দাবীর ভান্ডার বলে আখ্যায়িত হোক। তাহলে এবার তারাও আমাদের দলিল প্রমাণ উপস্থাপনের বিপরীতে তাদের দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করতে থাকুক। কেননা (কোন এক দলিল প্রমাণের) প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত ভিন্ন দলিল প্রমাণ দেখে সত্য বিষয় দ্রুত বুঝা যায়। (এভাবে) দুই কিতাবের পারস্পরিক তুলনা হলে দুর্বল ও শক্তিশালী এবং অপূর্ণ ও পূর্ণতমের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, নিজেই ওকীল (দলিল প্রমাণের উদগতা) বনে যাবেন না; বরং আমাদের মত দাবী ও দলিল প্রমাণ নিজের কিতাব থেকে উপস্থাপন করুন। আর ধর্মীয় বিতর্কের ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ বিষয়টিও আবশ্যকীয় মনে করুন, যে দলিল দিয়ে আমরা এখন শুরু করছি, এ দলিলের বিদ্যমানতা নিজের সাময়িকীতে নিজ কিতাবের সাহায্যার্থে উপস্থাপন করে দেখান। এভাবেই আমাদের প্রত্যেক সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এর বিপরীতে যে ধারাবাহিকতায় আমরা দলিল উপস্থাপন করেছি, অনুরূপ প্রমাণ নিজ কিতাব থেকে (নিজ দাবীর) সমর্থনে উপস্থাপন করুন। এ ব্যবস্থাপনায় খুবই দ্রুত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, এই কিতাবগুলোর মধ্যে কোন্ কিতাব নিজের সত্যতাকে প্রমাণ করে আর তত্ত্বজ্ঞানের অফুরন্ত সমুদ্রকে নিজের মাঝে ধারণ করে আছে। এখন আমি খোদা তাআলার সাহায্যে প্রথম নম্বর শুরু করছি। আর দোয়া করছি- ইয়া ইলাহী (হে আমার পরম উপাস্য)! সত্যের বিজয় দাও আর মিথ্যাকে লাঞ্ছিত ও পরাভূত করে দেখাও।

ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইউল আযীম। আমীন!

প্রথম অকাট্য যুক্তি প্রমাণ

কুরআন ও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের সপক্ষে দলিল

কুরআন শরীফ অতি জোরালোভাবে এ দাবী পেশ করেছে, এটা খোদা তাআলার কালাম আর সৈয়্যদনা ও মাওলানা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সত্য নবী ও রসূল, যাঁর প্রতি এ কালাম অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এ দাবী নিম্নোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টরূপে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۝

نَزَّلَ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩-৪)

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ। তাঁর কোন দ্বিতীয় সত্তা নেই। তাঁর থেকেই প্রত্যেকের জীবন ও স্থায়িত্ব। তিনিই সত্য ও যথার্থ প্রয়োজন অনুসারে তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আবার বলেছেন-

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدۡ جَآءَکُمُ الرَّسُوۡلُ بِالۡحَقِّ

(সূরা নিসা- ১৭১)

অর্থাৎ হে মানব মন্ডলী! সত্য ও যথার্থ প্রয়োজনসহ এ রসূল তোমাদের নিকট আগমন করেছে। আবার বলছেন-

وَبِالۡحَقِّ اَنۡزَلۡنٰهُ وَبِالۡحَقِّ نَزَلَ

(সূরা বনী ইসরাইল- ১০৬)

অর্থাৎ, যথার্থ প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে আমরা এই বাণী অবতীর্ণ করেছি। আর যথার্থ প্রয়োজন অনুসারেই এটা অবতীর্ণ হয়েছে।

আর পুনরায় বলছেন-

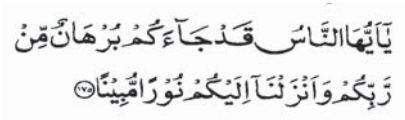

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٥﴾

(সূরা নিসা- ১৭৫)

অর্থাৎ হে মানবমন্ডলী! তোমাদের নিকট এ অকাট্য প্রমাণ পৌছেঁছে। আর এক প্রকাশ্য নূর আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি।

আরও বলেছেন-

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

(সূরা আরাফ- ১৫৯)

অর্থাৎ- লোকদের বলে দাও, আমি তোমাদের সবার জন্যই আল্লাহর রসূল হয়ে আগমন করেছি।

আবারও বলেছেন-

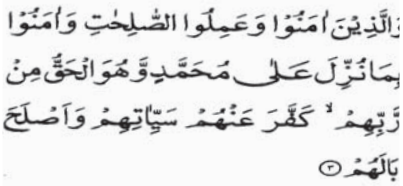

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا
بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ
رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ
بَالَهُمْ ﴿٣﴾

(সূরা মুহাম্মদ-৩)

অর্থাৎ, যে লোকেরা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে আর এই কিতাবের ওপর ঈমান আনে যা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এটাই সত্য, খোদা তাদের পাপ মোচন করে দিবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিবেন।

এমন আরও শত শত আয়াত আছে যেগুলিতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এ দাবী করা হয়েছে, কুরআন করীম খোদার বাণী আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সত্য নবী। কিন্তু কার্যত আমি এতটুকু লিখাটাই যথোপযুক্ত ও সমীচীন মনে করি। তবে এর সাথে আমি বিরুদ্ধবাদীদের এও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কুরআন করীমে এ দাবী যত জোরালোভাবে বিদ্যমান

রয়েছে এভাবে অন্য কোন কিতাবে কোন ভাবেই তা বিদ্যমান নেই। আমরা অত্যন্ত উদগ্রীব, আর্যরা তাদের বেদ থেকে অন্ততঃ এতটুকু প্রমাণ করে দিক, তাদের চারটি বেদ ঐশী বাণী হওয়ার দাবী করেছে এবং স্পষ্টভাবে বলছে, এগুলি ওমুক ওমুক ব্যক্তির উপর ওমুক ওমুক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। **আল্লাহর কিতাব হওয়া প্রমাণের জন্য সর্ব প্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে, স্বয়ং ঐ কিতাবই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হওয়ার দাবী করবে। কেননা যে কিতাব নিজে আল্লাহর পক্ষ থেকে (প্রেরিত) হওয়ার কোন ইংগিত করে না, সেটাকে খোদা তাআলার প্রতি আরোপ করা অনধিকার চর্চা ও অনুচিত কাজ।**

এখন দ্বিতীয় যে বিষয়টি এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য তা হচ্ছে, কুরআন করীম স্বয়ং আল্লাহ্ প্রদত্ত হওয়ার ও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত সম্পর্কে শুধুমাত্র দাবীই করেনি, বরং সেই দাবীকে অতি অকাট্য ও শক্তিশালী দলিল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্তও করে দিয়েছে। ইনশাআল্লাহ, ঐ দলিল প্রমাণাদী আমরা ধারাবাহিকভাবে লিখে দিব। আমি এ প্রবন্ধে ঐ দলিল প্রমাণাদি থেকে প্রথম দলিলটি উপস্থাপন করছি যাতে এই দলিলের ভিত্তিতে সত্যান্বেষীগণ সর্বপ্রথম অন্যান্য কিতাবের সাথে কুরআনের তুলনা করতে পারেন। এছাড়া আমরা প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকেও আহবান জানাই, এ রকম প্রমাণাদি যা কোন কিতাবে পাওয়াটা সেই কিতাবের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যদি তাদের কিতাবসমূহ ও নবীগণ সম্পর্কেও পাওয়া যায়, তাহলে তারা যেন অবশ্যই সেগুলো পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে দেয়। নতুবা তাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে, তাদের কিতাবসমূহ এমন উচ্চ মানের দলিল প্রমাণ শূন্য ও (এমন দলিল প্রমাণ থেকে) বঞ্চিত। আমরা অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থার সাথে বলছি, এ রকম প্রমাণাদী তাদের ধর্মে কখনও পাওয়া যাবে না। আর এতে আমরা যদি ভুলের মধ্যে রয়ে থাকি, তবে সে ভুল প্রমাণ করা হোক।

কুরআন শরীফ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়ার সপক্ষে প্রথম যে দলিল উপস্থাপন করে এর বিস্তারিত বর্ণনা হচ্ছে–

বিজ্ঞজন এক সত্য কিতাব ও এক সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ প্রেরিত রসূলকে মেনে নেয়ার জন্য এ বিষয়টিকে অত্যন্ত জোরালো দলিল হিসেবে মূল্যায়ন করেন- এমন সময়ে তাঁর আবির্ভাব হবে যখন যুগ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং লোকেরা তৌহিদের জায়গায় শির্ক, পবিত্রতার স্থলে অপবিত্রতা, ন্যায় বিচারের জায়গায় জুলুম, জ্ঞানের স্থানে অজ্ঞানতাকে অবলম্বন করবে।

আর একজন সংস্কারকের আবির্ভাবের প্রয়োজন প্রকট হয়ে ওঠবে। পরে আবার এমন সময়ে ঐ রসূল ইহজগত থেকে চলে যাবে যখন তাঁর সংস্কার ও সংশোধনের কাজ অত্যন্ত উত্তমভাবে সম্পন্ন হবে। তবে যতদিন তাঁর সংস্কার ও সংশোধনের কাজ সম্পন্ন হবে না, ততদিন তাঁকে শত্রুদের থেকে সুরক্ষিত রাখা হবে। তিনি আদেশ পেয়ে এক চাকরের ন্যায় আসবেন আবার আদেশ পেয়ে চলে যাবেন। মোট কথা, এমন এক সময়ে তিনি আগমন করবেন যখন যুগই চিৎকার করে বলতে থাকবে, এক ঐশী সংস্কারক ও কিতাব এর আগমন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। আবার তাঁকে ফিরে যেতে ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে এমন সময়ে ডেকে পাঠানো হবে, যখন সংশোধনের চারাগাছ দৃঢ়ভাবে লাগানো হয়ে যাবে এবং এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাবে।

এখন, এ কথা আমরা অত্যন্ত গর্বের সাথে উল্লেখ করছি, যেভাবে কুরআন ও আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে এ প্রমাণ অতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছে, অন্য কোন নবী ও কিতাবের ক্ষেত্রে কখনই সেভাবে হয়নি। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দাবী ছিল– আমি সব জাতির জন্য আগমন করেছি। এ কারণে কুরআন শরীফ সব জাতিকে (ন্যায্যত) এ অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল তারা বিভিন্ন শির্ক, পাপ-পঙ্কিলতা ও অনাচারে লিপ্ত রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ *(সূরা রূম-৪২)*

অর্থাৎ সাগরও কলুষিত হয়েছে, ভূপৃষ্ঠও কলুষিত হয়েছে। আবার বলা হয়েছে-

لِيَكُونَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ *(সূরা ফুরকান-২)*

অর্থাৎ আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি যাতে তুমি সকল জাতিকে সতর্ক করতে পার। তাদের এ কথা জানিয়ে দিতে পার, তারা নিজেদের পাপ কাজ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের দরুন খোদা তাআলার নিকট নিকৃষ্ট পাপীরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

স্মরণ রাখতে হবে, এই আয়াতে **'নযীর'** শব্দটি পৃথিবীর সকল জাতির জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, পাপাচারী ও অনাচারীদের ভীতি প্রদর্শন করা। এ শব্দ থেকে নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়, কুরআনের এই দাবী ছিল, গোটা

পৃথিবী কলুষিত হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই সত্যবাদিতা ও সৎকর্মের পথ পরিত্যাগ করেছে। কেননা অবাধ্য, মুশরেক, পাপী, অনাচারী ও অন্যান্যরাই হলো ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্য। আর অপরাধীদের সাবধান করার লক্ষ্যেই সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। পুণ্যবানদেরকে নয়। এ কথা তো প্রত্যেকেই জানে, অবাধ্য ও বেঈমানদের সব সময় ভীতি প্রদর্শন করা হয়। আর সুন্নাতুল্লাহ্ও (আল্লাহর নিয়ম) এটাই, নবী পুণ্যবানদের জন্য হন **বশীর** (সুসংবাদদাতা) এবং পাপীদের জন্য **নযীর** (সতর্ককারী)। তদুপরি, একজন নবীই সমস্ত পৃথিবীর জন্য যখন নযীর (সর্তককারী) হয়ে এসেছেন, তখন মানতে হবে নবীর এ ওহী সমস্ত পৃথিবীকে মন্দ কর্মে লিপ্ত সাব্যস্ত করছে। আর এটা এমন এক দাবী, যা না তৌরাত মূসার (আঃ) সম্পর্কে করেছে, না ইঞ্জিল ঈসা আলাইহিস সালামের যুগ সম্পর্কে করেছে। বরং কেবলমাত্র কুরআন শরীফই এ দাবী করেছে। আর এ কথাও বলছে-

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ

(সূরা আলে ইমরান-১০৪)

অর্থাৎ, তোমরা এই নবীর আগমনের পূর্বে দোযখের গর্তের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলে। তাছাড়া, খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিল, তোমরা তোমাদের মিথ্যাচারিতা ও ধোঁকা দ্বারা খোদার কিতাবগুলোকে বদলিয়ে ফেলেছো। আর তোমরা প্রত্যেক দুস্কৃতি এবং অপকর্মে সকল জাতির চেয়ে অগ্রগণ্য রয়েছো। আর বিভিন্ন স্থানে পৌত্তলিকদেরকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে-তোমরা পাথর, মানুষ, নক্ষত্র ও নানান বস্তুর পূজা করছো। আর প্রকৃত স্রষ্টাকে ভুলে বসেছো। এছাড়াও তোমরা এতীমের মাল খাচ্ছ, শিশুদের হত্যা করছো, * অংশীদারদের প্রতি জুলুম করছো এবং সর্বক্ষেত্রেই সীমালংঘন করে চলেছো। এজন্য বলা হয়েছে-

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

টীকা :

যেভাবে বলা হয়েছে-

يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ

(সূরা নাহল-৬০)

অর্থাৎ এ বিষয়টি তোমাদের জানা উচিত, পুরো পৃথিবীটাই মরে গিয়েছিল, এখন খোদা তাআলা এটাকে নতুনভাবে জীবিত করেছেন। মোট কথা, কুরআন করীম সমগ্র পৃথিবীকে শিরক, অনাচার ও মূর্তিপূজার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, যা সব অপকর্মের জননী। আর খ্রিষ্টান ও ইহুদীদেরকে সারা পৃথিবীর সব অপকর্মের মূল হোতা বলে আখ্যায়িত করেছে এবং তাদের প্রত্যেকটি অপকর্মের বিবরণ দিয়েছে। আর সমসাময়িক যুগের এমন এক চিত্র অঙ্কন করেছে, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবী সৃষ্টি অবধি একমাত্র নূহ (আঃ) এর যুগ ছাড়া অন্য কোন যুগে দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ প্রসঙ্গে আমরা যে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছি, প্রাথমিকভাবে প্রমাণের জন্য তা-ই যথেষ্ট। এ জন্য প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা প্রাসঙ্গিক সব আয়াতের উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম। কুরআন শরীফ গভীর মনোযোগ সহকারে সুধী পাঠকবৃন্দের পাঠ করা উচিত, যাতে তারা বুঝতে পারেন কুরআন কত জোরালোভাবে, কত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করেছে-সারা পৃথিবী কলুষিত হয়ে গেছে, সারা পৃথিবী মরে গেছে, লোকেরা দোযখের কিনারায় পোঁছে গেছে। আর কিভাবে বার বার বলছে-সারা পৃথিবীকে সতর্ক করে দাও, সে দারুন বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে আছে। অবশ্যই কুরআন পাঠ করলে বুঝা যায়, পৃথিবী শিরক, অবাধ্যতা, মূর্তিপূজা ও বিভিন্ন প্রকারের পাপে (লিপ্ত হয়ে) পঁচে গেছে। আর অপকর্মের গভীর গহব্বরে তলিয়ে

টীকার বাকি অংশ :

অর্থাৎ মুশরেকরা নিজেদের মেয়েদেরকে জীবন্ত পোঁতে ফেলতো! আরও বলা হয়েছে-

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝

(সূরা তাকভীর-৯.১০)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জীবন্ত পোঁতে ফেলা মেয়েদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, তাদের কোন্ পাপের কারণে হত্যা করা হয়েছে? দেশের বিদ্যমান অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে–অমুক অমুক অপকর্ম হচ্ছে। এরই প্রতি আরবের এক প্রাচীন কবি ইবনুল আরাবী ইঙ্গিত করে বলেছেন-

ما لقى الموود من ظلم امه

كما لقيت ذهل جميعا و عامر

অর্থাৎ- জীবন্ত সমাধীস্ত মেয়েদের উপর তাদের মায়ের পক্ষ থেকে এ জুলুম করা হতো না। যেভাবে যোহল ও আমেরের উপর হয়েছে।

গেছে। এ কথা ঠিক, ইঞ্জিলের মধ্যেও ইহুদীদের মন্দ চালচলনের অল্পস্বল্প বিবরণ আছে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে যত লোক আছে, যাদেরকে আলামীন (সমস্ত জগদ্বাসী) নামে অভিহিত করা যেতে পারে তারা কলুষিত হয়ে গেছে, মরে গেছে এবং পৃথিবী শিরক ও পাপে ছয়লাভ হয়ে গেছে বলে মসীহ্ কোথাও উল্লেখ করেন নি। আর না-ই সার্বজনীন রিসালতের (নবুওয়তের) দাবী করেছেন। এটা সুস্পষ্ট, ইহুদীরা ছিল একটা ছোট্ট জাতি। যারা মসীহ্র সম্বোধিত ও দৃষ্টির আওতাভুক্ত ছিল এবং তারা মাত্র কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা ছিল। পক্ষান্তরে, কুরআন করীম সারা পৃথিবীর মরে যাওয়া উল্লেখ করেছে। প্রত্যেকটি জাতির খারাপ অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা বলেছে, আর বলেছে প্রত্যেক প্রকারের পাপে পৃথিবী মরে গেছে। ** ইহুদীরা নিজেদেরকে নবীদের সন্তান ও তওরাতের অনুসরণকারী বলে দাবী করতো, যদিও তারা আমলের দিক থেকে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কুরআনের যুগের মানুষ পাপ পঙ্কিলতা ছাড়াও বিশ্বাসের দিক থেকে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল। হাজারো মানুষ ওহী ইলহামে (ঐশী বাণী) অস্বীকারকারী হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক প্রকারের মন্দকর্ম পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল।

পৃথিবীতে তখন বিশ্বাস ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই মন্দের এক তুফান বয়ে যাচ্ছিল। এছাড়া, মসীহ তো তাঁর ছোট্ট জাতি ইহুদীদের মন্দ চালচলনের কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন, যা থেকে এটা অবশ্যই ধারণা করা যায়, সে সময় ইহুদীদের এক বিশেষ জাতির জন্য একজন সংস্কারকের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার সপক্ষে আমরা যে দলিল উপস্থাপন করছি, অর্থাৎ সার্বজনীন ফাসাদের যুগে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন এবং সম্পূর্ণরূপে সংস্কার ও সংশোধনের পর তাঁর প্রত্যাগমন হয়েছে। এ দু'টি দিককেই কুরআন শরীফের উপস্থাপন ও সেদিকে জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ, এটা এমন এক বিষয়, যা ইঞ্জিল কেন? কুরআন শরীফ ছাড়া পূর্ববর্তী কোন কিতাবেই পাওয়া যাবে না। কুরআন শরীফ নিজেই এ দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। আর নিজেই ঘোষণা

**নোটঃ কেউ যদি বলেন- বিশৃংখলা, কুবিশ্বাস ও মন্দকর্মে এ যুগও তো কম যায় না। তবুও কেন এযুগে একজন নবী আসেন নি? এর উত্তর হলো, সে যুগে তওহীদ (একত্ববাদ) ও সোজা পথ বিলীন হয়ে গিয়েছিল, আর এ যুগে ৪০ কোটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠকারী বিদ্যমান রয়েছে। এবং এ যুগকেও আল্লাহ তাআলা মুজাদ্দেদ (সংস্কারক) প্রেরণ করা থেকে বঞ্চিত রাখেননি।

দিয়েছে, এই দুই ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিলেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ এক তো হলো তা, যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি, তিনি (সাঃ) এমন এক যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন সামগ্রিকভাবেই বিভিন্ন ধরণের পাপাচার ও কু-বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল। আর পৃথিবী সত্য, সত্যতা, তৌহিদ ও পবিত্রতা থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিল। কুরআন শরীফের এ কথার সত্যতা তখনই পাওয়া যায় যখনই তুলনামূলকভাবে সেই সময়ের প্রত্যেকটি জাতির ইতিহাস পাঠ করা হয়। কেননা, প্রতিটি জাতির স্বীকারোক্তি থেকে এ সাক্ষ্য পাওয়া যায়, সেই যুগ বাস্তবেই এমন ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল যে, প্রত্যেক জাতি সৃষ্টির পূজার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। আর এ কারণে কুরআন যখন প্রত্যেক জাতিকে ভ্রান্ত ও দুস্কৃতকারী বলে আখ্যায়িত করলো, তখন কেউ নিজেদেরকে এটা থেকে মুক্ত বলে প্রমাণ করতে পারলো না। দেখ, আল্লাহ তাআলা কত জোরালোভাবে আহলে কিতাবদের অপকর্মসমূহের ও সারা পৃথিবীর মরে যাবার কথা ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন-

وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ
قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿١٧﴾
اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ﴿١٨﴾

(সূরা আল হাদীদ- ১৭,১৮)

অর্থাৎ মোমেনদের উচিত, তারা যেন আহলে কিতাবদের চাল-চলন পরিহার করে চলে। কেননা তাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। এরপর তাদের উপর এক দীর্ঘ যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। ফলে, তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই ফাসেক ও দুস্কৃতকারী হয়ে গেছে। এ কথাও জেনে রেখ, পৃথিবী মরে গিয়েছিল, আর খোদাতাআলা পুনরায় নতুন করে পৃথিবীকে জীবন্ত করে তুলছেন। এটা কুরআনের প্রয়োজনীয়তা ও সত্যতার নিদর্শন। আর এটা এ জন্য বর্ণনা করা হলো যেন তোমরা নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা কর। এখন চিন্তা করে দেখ, এই দলিল যা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা আমাদের মনগড়া কথা নয়। বরং কুরআন নিজেই এটা পেশ করেছে। আর দলিলের উভয় অংশ বর্ণনা করার পর আবার নিজেই বলছে-

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ۝

(আল হাদীদ-১৮)

অর্থাৎ এই রসূলের এবং এই কিতাবের আল্লাহর পক্ষ থেকে হবার এটাও এক নিদর্শন যা আমরা বর্ণনা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর, বুঝ ও সত্যে উপনীত হতে পার।* এই দলিলের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তখনই দুনিয়া থেকে তাঁর প্রভুর দিকে ডেকে নেয়া হয়েছে, যখন তিনি তাঁর কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করেছেন। আর এ বিষয়টি কুরআন শরীফ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত।

***টীকা ঃ**

কুরআন শরীফ নিজের অবতীর্ণের সমসাময়িক যুগের খ্রিষ্টান ও অন্যান্যদের মাঝে বিদ্যমান মন্দকর্মের যে বর্ণনা দিয়েছে, তা ঐ জাতিসমূহ নিজের মুখেই স্বীকার করে নিয়েছে। বরং বার বার স্বীকার করেছে তারা মন্দকর্মে লিপ্ত রয়েছে। আর আরবের ইতিহাস পাঠ করলে এ বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়, আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতৃপুরুষদেরকে শির্ক ও অন্যান্য মন্দ জিনিস থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। বাকি লোকেরা খ্রিষ্টানদের মন্দ দৃষ্টান্ত ও তাদের চালচলনের মন্দ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বিভিন্ন প্রকারের নির্লজ্জ পাপাচার ও মন্দ চালচলনে নিমজ্জিত ছিল। আর যে পরিমাণ মন্দ চালচলন ও মন্দকর্ম আরবে এসেছিল এটা আসলে আরবদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে ছিল না। বরং তাদের মাঝে অত্যন্ত অপবিত্র ও মন্দ চালচলনে (মত্ত) এক জাতি বসতি স্থাপন করেছিল। যারা প্রায়শ্চিত্তবাদের এক মিথ্যা পরিকল্পনার উপর ভর করে প্রত্যেক পাপকে মায়ের দুধের ন্যায় (বৈধ) মনে করতো। সৃষ্টির উপাসনা, মদ পান ও প্রত্যেক প্রকারের মন্দকর্মকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে জগতে ছড়ানো হচ্ছিল। আর তারা প্রথম সারির মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও দুশ্চরিত্র ছিল। বাহ্যিকভাবে এ পার্থক্য করা কঠিন ছিল, ঐ যুগে পাপ-পঙ্কিলতা, অনাচার ও প্রত্যেক প্রকার মন্দ চালচলনে কারা প্রথম সারিতে ছিল–ইহুদীরা না খ্রিষ্টানরা। তথাপি, কিছুটা চিন্তা-ভাবনার পর বুঝা যাবে, প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টানরাই প্রত্যেক পাপাচার, মন্দ চালচলন ও অংশীবাদি রীতিনীতিতে অগ্রসর ছিল। কেননা ইহুদীরা বার বার লাঞ্ছনা ও দু:খকষ্টে (পতিত হওয়ার) কারণে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। আর ঐ অপকর্মসমূহ যা এক হীন (প্রকৃতির) লোক নিজের শক্তি, ধনসম্পদ ও জাতীয় উত্থানকে প্রত্যক্ষ করে করতে পারে বা ঐসব মন্দকর্ম যা সম্পদ ও অর্থের অধিক্যের উপরে নির্ভরশীল, ইহুদীরা এ রকম বাজে কর্মের কম সুযোগই পেত। কিন্তু খ্রিষ্টানদের ভাগ্যের চাকা উন্নতির দিকে ছিল। নতুন ধন সম্পদ ও নতুন রাজত্ব তাদেরকে প্রতি মুহূর্তে প্ররোচিত করছিল ঐ সব

চলমান টীকা

যেভাবে আল্লাহ জাল্লা শানহু বলেছেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (*সূরা আল মায়েদা-৪*)

টীকার বাকি অংশ ঃ

উপাদান নিজেদের মাঝে একত্রিত করে নিতে যা মন্দ কর্মের শক্তি যোগানোর ক্ষেত্রে সর্বদা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং ঐ যুগের খ্রিষ্টানদের মাঝে মন্দ চালচলন ও প্রত্যেক প্রকারের মন্দকর্ম সবচে' বেশি থাকার এটাই কারণ ছিল। আর ঐ ঘটনাগুলো এতোই প্রসিদ্ধ, পাদ্রী ফিন্ডেল (FINDEL) কট্টর গোঁড়ামি সত্ত্বেও এগুলোকে গোপন রাখতে পারেন নি। বাধ্য হয়ে ঐ যুগের খ্রিষ্টানদের মন্দ চালচলনকে সত্যের পরাকাষ্ঠে স্বীকার করতেই হয়েছে। কিন্তু অন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ খুবই বিস্তারিতভাবে তাদের মন্দ চালচলনের বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং তাদের একজন ডেভেন পোর্ট (DAVENPORT) সাহেবের পুস্তক রয়েছে, যা এদেশে ভাষান্তর হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাই, এটা প্রমাণিত সত্য বিষয়, ঐ যুগের খ্রিষ্টানরা নিজেদের নতুন ঐশ্বর্য, রাজত্ব ও প্রায়শ্চিত্তবাদের বিষাক্ত আন্দোলনের ফলে প্রত্যেক মন্দ চালচলনে সবচে' অগ্রণী ছিল। প্রত্যেকে নিজের স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী সীমালঙ্ঘন ও পাপের ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিল। তাদের সাহস দেখে মনে হতো তারা নিজেদের ধর্মের সত্যতার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। তারা নীরব নাস্তিক ছিল। তাদের আধ্যাত্মিকতার ব্যাপক মূলোৎপাটন হওয়ার কারণ ছিল, তাদের সামনে জগৎ লাভের দ্বারগুলো খুলে গিয়েছিল। আর ইঞ্জিলের শিক্ষার মাঝে মদের ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। জুয়া খেলতেও কোন বাধা নিষেধ ছিল না। সুতরাং এই সব বিষয় মিলে তাদের পূত পবিত্রতা ধ্বংস করেছিল। সিন্দুকে সম্পদ ছিল, রাজত্ব করায়ত্বে ছিল, মদ* নিজেরাই আবিষ্কার করে নিয়েছিল। এরপর আর কিসের প্রয়োজন! পাপের জননীর প্রভাবে সব মন্দকর্মই তাদেরকে করতে হয়েছে। এ কথাগুলো আমরা নিজেরা বানিয়ে বলছি না। নামীদামী ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ নিজেরাই এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর এখনও দিয়ে যাচ্ছেন। এযুগেও মহামতি পাদ্রী বাস্ওয়ার্থ ও বিজ্ঞ কিসিস টেইলর কতই না স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেছেন আর কত না জোরালোভাবে এ বিষয়টিকে প্রমাণ করেছেন যে, খৃষ্ট ধর্মের প্রাচীন মন্দ চালচলনই তাদেরকে ধ্বংস করেছে! সুতরাং জাতির গৌরব পাদ্রী বাসওয়ার্থ সাহেব তার নিজের বক্তব্যে উচ্চ স্বরে ঘোষণা দিয়েছেন, খ্রিষ্টানদের সাথে তিনটি অভিসম্পাত আবশ্যকীয়ভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে, যা তাদেরকে উন্নতির পথে বাধা দেয়।

*** পাদটীকা ঃ**

মদ তৈরী করা হযরত ঈসা (আঃ) এর এক মোযেযা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এমন কি মদ পান করা খৃষ্ট ধর্মের এক প্রধানতম অংশ। যেভাবে আশায়ে রব্বানী (যীশুখৃষ্ট তার হাওয়ারীদের সাথে যে সর্বশেষ খাবার খান) থেকে প্রমাণিত।

অর্থাৎ আজ আমি কুরআন অবতীর্ণ ও মানব হৃদয়ের পরিপূর্ণতা সাধনের মাধ্যমে তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার

টীকার বাকি অংশ ঃ

এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে- ব্যভিচার, মদ্যপান ও জুয়া। সুতরাং সেই যুগে মন্দকর্মে সবচে' বেশি অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে খৃষ্টানরাই সবচে' উপযুক্ত ছিল। কেননা পৃথিবীতে মানুষ কেবলমাত্র তিনটি কারণে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

১) খোদা তাআলার ভয়।

২) মালের আধিক্য যা অপকর্মের প্রধান মাধ্যম, এর কুফল থেকে বেঁচে থাকা।

৩) দুর্বল ও বিনয়ী হয়ে জীবন যাপন করা যাতে শাসক হওয়ার স্পৃহা না জন্মে।

কিন্তু খ্রিষ্টানরা এই তিন বাধা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রায়শ্চিত্তবাদের বিশ্বাস তাদেরকে পাপ করতে সাহসী বানিয়ে দিল। আর ধন-সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অত্যাচারী হতে সহায়ক হয়ে গেল। কেননা তারা পার্থিব জগতের ভোগ বিলাস, কল্যাণরাজি ও ধন-সম্পদে প্রাচুর্য্যের অধিকারী এবং এক শক্তিশালী রাজ্যের মালিকও হয়ে গেল। আর পূর্বে যেহেতু তারা একটা সময় পর্যন্ত নিঃস্ব, দারিদ্র ও কঠিন কষ্টে নিপতিত ছিল, এজন্য সম্পদ ও রাজত্ব লাভের পর তাদের মধ্যে অতি অদ্ভুত মাত্রায় পাপ-পঙ্কিলতা ও অনাচারের তুফান বইতে লাগলো। যেভাবে শক্তিশালী প্লাবনের সময় বাঁধ ভেঙ্গে যায়, আর বাঁধ ভাঙ্গার কারণে চারপাশের সমস্ত জমি ও বসতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেভাবে ঐ দিনগুলোতে ঘটেছে, যখন খ্রিষ্টানদের নিকট যৌনাচারের সব সামগ্রী সহজলভ্য হয়ে গেল এবং তারা ধন-সম্পদ, শক্তি সামর্থ ও রাজত্বের দিক থেকে সমগ্র পৃথিবীতে ক্ষমতাধরদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে গেল। ক্ষুধার্ত পীড়িত এক হীন ব্যক্তি ধন-সম্পদ ও শাসন ক্ষমতা পেয়ে যেভাবে নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করে ঠিক সেভাবে তারাও (অর্থাৎ খ্রিষ্টানরা) তা দেখিয়েছে। প্রথমতঃ তারা অসভ্য ও হিংস্র অত্যাচারীদের মত হত্যাকান্ড চালিয়েছে। অন্যায়ভাবে অকারণে কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে এবং অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার প্রদর্শন করেছে। যা শুনে গা শিউরে উঠে। আর পরে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা পেয়ে তারা দিন রাত মদ্যপান, ব্যভিচার ও জুয়া খেলাতে নিমগ্ন হয়ে পড়ল। সুতরাং তাদের দুর্ভাগ্য প্রায়শ্চিত্তবাদের শিক্ষা পূর্বেই তাদেরকে পাপাচারে বেপরোয়া করে দিয়েছিল। 'একে তো নাচুনে বুড়ি, তার উপর ঢোলের বাড়ি।' যখন লক্ষ্মী (অর্থাৎ ধন সম্পদ ও শাসন ক্ষমতা) তাদের ঘরে এসে গেল, তখন তাদেরকে রুখবার আর কে রইল? ফলে তারা প্রত্যেক মন্দ কর্মে এভাবে হামলে পড়ে যেভাবে এক শক্তিশালী প্লাবন উন্মুক্ত রাস্তা পেয়ে দ্রুতবেগে ধাবিত হতে থাকে। আর এটা রাজ্যের উপর এমন মন্দ প্রভাব ফেললো যে, অজ্ঞ ও নির্বোধ আরববাসীরা এর মন্দ প্রভাবে ফেঁসে গেল। কেননা তারা তো এমনিতেই নিরক্ষর ও অশিক্ষিত ছিল। তাই যখন তারা নিজেদের চারপাশের খ্রিষ্টানদের মাঝে মন্দকর্মের ঝড় বইতে দেখতে পেল তখন তারাও এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে গেল। এ বিষয়টি গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, আরবে জুয়াখেলা,

অনুগ্রহরাজীকে তোমাদের উপরে পূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করলাম। এর তাৎপর্য এটাই, কুরআন মজীদ যতটুকু

টীকার বাকি অংশ ঃ

মদ্যপান ও ব্যভিচার খ্রিষ্টানদের ধনভান্ডার থেকে এসেছিলো। খ্রিষ্টান আখতাল ঐ যুগের একজন বড় কবি ছিল। যার কাব্যগ্রন্থকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। বর্তমানে বৈরুতে এক খ্রিষ্টান সম্প্রদায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ও অতি সুন্দরভাবে এই কাব্যগ্রন্থ ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে। এটা এদেশেও এসেছে। এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলো পঙক্তি তার স্মৃতি গাঁথা। যা তার ও তার সমসাময়িক যুগের খ্রিষ্টানদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার চিত্রকে প্রকাশ করছে। এর একটি পঙক্তি এমন-

بان الشباب و ربما عللته

بالغانيات و بالشراب الاصحب

অর্থাৎ, যৌবন আমায় ছেড়ে চলে গেছে। তবুও আমি এটাকে ধরে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি। পরমা সুন্দরী ললনা ও লাল মদের মাঝে নিজেকে মগ্ন রেখেছি।

এই পঙক্তি থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট, ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের একজন বিজ্ঞ পন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারের অতি নোংরামিতে মত্ত ছিল। তবে সবচে' লজ্জাকর ব্যাপার হচ্ছে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে ব্যভিচার থেকে বিরত ছিল না। আর শুধু এতেই সে ক্ষান্ত ছিল না, বরং মদপানে সে ভীষণ অভ্যস্থ ছিল। আখতাল এর জীবনী সম্পর্কে যারা অবগত তারা এ বিষয়টি খুব ভাল করে জানেন, সে ঐ যুগের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মাঝে খুবই সম্মানিত, জ্ঞানী ও বিজ্ঞ লোক বলে পরিচিত ছিল। আর এমন লোক তাদের মাঝে একজনই ছিল। তার রচনাবলী থেকে বুঝা যায়, সে কেবল মাত্র প্রায়শ্চিত্তবাদের ধ্যান ধারণাকে কাব্যিক ছন্দে প্রকাশ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সে একজন পাদ্রীও ছিল। এর প্রেক্ষিতে মনে করা হয়, সে স্বীয় পুস্তকে যে গির্জাগুলোর উল্লেখ করেছে সে এর মধ্যে প্রধান পাদ্রীর পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। আর সব লোক তাকে পুরোপুরি অনুসরণ করে চলতো। ঐ যুগের খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে তার একক জীবন বৃত্তান্ত এটার দলিল নয় কি? কোটি কোটি খ্রিষ্টান ও পাদ্রীর মধ্যে শুধুমাত্র সে-ই একমাত্র ব্যক্তি, যার স্মারক তেরশ বছর পর এই যুগে পাওয়া গেছে। মোট কথা, খ্রিষ্টানদের মাঝে একমাত্র আখতাল-ই প্রাচীন খ্রিষ্টানদের চালচলনের দৃষ্টান্ত আত্মজীবনী হিসেবে রেখে গেছে। এটা শুধু তার নিজের অবস্থা নয় বরং সে সাক্ষ্য দিয়েছে, তার সমসাময়িক সব খ্রিষ্টানদের অবস্থাই এমন ছিল। আর মূলত এই চালচলনের ধারাবাহিক বাস্তবায়নই আজ পর্যন্ত ইউরোপে অব্যাহত রয়েছে। খৃষ্ট ধর্মের মূলকেন্দ্রস্থল 'কেনান' ছিল। এ দেশ থেকে এ ধর্ম ইউরোপ এসেছে এবং এর সাথেই মন্দ চালচলন উপহাররূপে তারা পেয়েছে।

অবতীর্ণ হবার ছিল হয়ে গেছে। আর আগ্রহী হৃদয়গুলিতে বিস্ময়কর ও আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত করেছে। তাদের তরবিয়তকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। নিজের

টীকার বাকি অংশ ঃ

সুতরাং আখতাল এর কাব্যগ্রন্থ অত্যন্ত সমাদর যোগ্য। কেননা এটা ঐ যুগের খ্রিষ্টানদের চালচলনের সমস্ত পর্দাকে উন্মোচন করেছে। তবে ইতিহাস এ তথ্য দিতে পারে নি, ঐ যুগে খ্রিষ্টানদের মাঝে এমন আর কেউ ছিল কি যার কোন রচনা খ্রিষ্টানদের হাতে রয়েছে? আখতাল এর জীবন বৃত্তান্তের দিকে দৃষ্টি দিলে আমাদেরকে স্বীকার করতে হয়, সে ইঞ্জিল সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত ছিল। কেননা ঐ যুগের সমস্ত খ্রিষ্টান ও পাদ্রীদের মাঝে বিশেষভাবে সে-ই নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতাকে তুলে ধরেছে। যা ঐ যুগের অন্য কোন খ্রিষ্টান ও পাদ্রী তুলে ধরতে পারে নি। তাই আমাদেরকে মানতে হবে সে ঐ যুগের খ্রিষ্টানদের এক জলজ্যান্ত উপমা। আপনারা (উপরে) পড়ে এসেছেন, সে একথা নিজের মুখে স্বীকার করছে, আমি পরমা সুন্দরী মহিলা ও উৎকৃষ্ট মদ দিয়ে বৃদ্ধ হওয়ার দুঃখ নিবারণ করি। আর ঐ যুগের কবিরা নিজেদের কুকর্মের বিবরণ এরূপ অলঙ্কারিক (কাব্যিক) ভাষাতেই প্রকাশ করতো। তারা বর্তমান যুগের নির্বোধ কবিদের ন্যায় শুধুমাত্র কৃত্রিম চিন্তাভাবনাকে গতানুগতিক ধারায় প্রকাশ করতো না। বরং নিজের জীবনের ঘটনাবলীর চিত্র অংকন করে দেখাতো। এ কারণে তাদের কাব্যগ্রন্থকে গবেষকরা তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেন নি। বরং ঐতিহাসিক পুস্তকের মর্যাদা দান করেছেন। আর এগুলো প্রাচীন কালের রীতিনীতি, অভ্যাস, আবেগ-অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে। এ কারণে ইসলামের অনুসারী, যারা জ্ঞান তপস্বী ছিলেন তারা এদের (অর্থাৎ কবিদের) কবিতা ও কাব্যগ্রন্থগুলোকে কখনও নষ্ট করেন নি। যাতে প্রত্যেক যুগের মানুষ প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে ইসলামের পূর্বে আরবের অবস্থা কেমন ছিল। আর সর্বশক্তিমান খোদা ইসলামের পরে তাক্ওয়া ও পবিত্রতার রঙে তাদের কেমন রঙ্গিন করেছেন। যদি **'আখতাল' 'দেওয়ানে হামাসা', 'সাবআ মুয়াল্লাকা' ও 'আগানীর'** ঐ কবিতাগুলো যা জাহেলিয়্যতের (অন্ধকার) যুগের কবিদের (ব্যাপারে) আগানীর লেখক লিখেছেন এবং যা 'লিসানুল আরব' ও 'সিহাহে যাওহারী' ও অন্যান্য প্রাচীন বই-পুস্তকে বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোকে দৃষ্টিপটে রেখে এর বিপরীতে ইসলামকে দেখা হয়। তাহলে ঐ অন্ধকার যুগে ইসলামের আবির্ভাব স্পষ্টত: এমন মনে হবে, যেন ঘোর অন্ধকারে হঠাৎ এক সূর্য্যের উদয় ঘটেছে। এভাবে তুলনা করলে এটাকে এক অলৌকিক দৃশ্য মনে হবে এবং হৃদয়ে ধ্বনিত হবে আল্লাহু আকবার! ঐ সময়ে কুরআনের অবতীর্ণ হওয়া কতই না জরুরী ছিল! বাস্তবে এই অকাট্য দলিল সব বিরুদ্ধবাদীকে পদদলিত করে দিয়েছে।

পুনরায় আমি আমার বিষয় বস্তুর দিকে ফিরে আসছি। আখতাল সম্পর্কে কোন নির্বোধ হয়তো এ প্রশ্ন তুলতে পারে আখতাল তার বৃদ্ধ বয়সে পরমা সুন্দরী মহিলাদের বিয়ে করেছিল। এটা কি তার জন্য বৈধ হয়নি? এ জন্য এ অবস্থায় এটা তার উপর

অনুগ্রহরাজীকে তাদের উপর পূর্ণ করে দিয়েছে। আর এগুলো হচ্ছে সেই দু'টি

টীকার বাকি অংশ ঃ

ব্যভিচারের অপবাদ কি করে হতে পারে? তো এর উত্তর হলো, 'এই সুন্দরী মহিলারা আমার স্ত্রী' আখতাল তার কবিতায় কখনও এ বিষয়টি প্রকাশ করে নি । বরং সে এমন বাচন ভঙ্গিতে নিজের কথাগুলোকে প্রকাশ করেছে যেভাবে এক লম্পট ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সর্বদা করে থাকে। এ কারণে সে পরমা সুন্দরী মহিলাদের সাথে উৎকৃষ্ট মদকে সংযুক্ত করেছে। কেননা মদ মন্দকর্মের জন্য আবশ্যকীয় বস্তুর একটি। এছাড়া এ বিষয়টি কারো অজানা নয় খৃষ্ট ধর্ম অনুসারে শুধু মাত্র একজন স্ত্রী-ই বৈধ। তারপর এটা কিভাবে সম্ভব ছিল, স্ব-জাতির লোকেরা ধর্ম ও রীতিনীতি ভঙ্গ করে তার কাছে নিজেদের পরমা সুন্দরী মেয়েদেরকে তুলে দেয়। এটা যদি স্বীকার করা হয়, সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে সমগ্র জাতির মাঝে সেরা ছিল। যেভাবে এ যুগে একজন রোমান ক্যাথলিক বিশপের একটা বিশেষ সম্মান নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে থাকে। ঐ সম্মান-ই অথবা এর চেয়ে বেশি সম্মান তার অর্জিত হয়েছিল। সে নেতা, অগ্রপথিক ও সমগ্র জাতির সম্মানের পাত্র ছিল। তথাপি এটা কিছুতেই সম্ভব নয় লোকেরা প্রাচীন রীতিনীতি পরিহার করে স্বেচ্ছায় নিজেদের পরমা সুন্দরী মেয়েদেরকে তার সাথে বিয়ে দিবে। আর সে উচ্চস্বরে কবিতা আবৃত্তি করে যাবে–সে শুধুমাত্র ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এ অবৈধ কাজ করেছে। এ জন্য এর সাথে মদ ও কাবাবকেও জুড়ে দিয়েছে। এটা কেউ কি মেনে নেবে? একে তো সে বৃদ্ধ, তদুপরি মেয়েদের সতীনের কষ্ট। আর এক মেয়ের বর্তমানে আরেক মেয়ে দেয়া এটা ধর্মের পরিপন্থী, রীতিনীতির পরিপন্থী ও জাতীয় ঐক্যেরও পরিপন্থী। তবুও লোকেরা অন্ধ হয়ে আখতাল মিয়াকে নিজেদের সুন্দরী মেয়েদের দিয়ে যাচ্ছে এবং সাথে দুই তিন পাত্র মদও দিয়ে যাচ্ছে। নি:সন্দেহে এ ধ্যান ধারণা কেউ মেনে নিবে না। আসল বিষয় তাই, যা আমরা লিখেছি। যার দৃষ্টান্ত আজও ইউরোপে শত নয়, হাজার নয় বরং লক্ষ লক্ষ বিদ্যমান রয়েছে। ইউরোপ সফরে সমুদ্র অতিক্রমের পরই এ দৃশ্য সর্বত্র দৃষ্টিতে আসবে। এ ছাড়া আখতালের শুধুমাত্র এ পঙক্তি নয়। বরং এর চেয়েও অগ্রসরমান আরেকটি পঙক্তি "দেওয়ানে আখতাল" এ রয়েছে। যা এখন উপহার হিসেবে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করছি। তা হলো–

ان من يدخل الكنيسة يوما

يلقى فيها جاذر و ظباء

এই পঙক্তির অনুবাদ হচ্ছে, যদি আমাদের গির্জায় কেউ কোন দিন যায়। তাহলে অনেক ছাগল ছানা ও হরিণ সেখানে পাবে। অর্থাৎ অপরূপা, যুবতী, সুশ্রী ও চতুর মহিলাদের দেখে আনন্দিত হবে। অর্থাৎ আখতাল মিয়া এর মাধ্যমে লোকদের প্রলোভন দিচ্ছে, তোমাদের অবশ্যই গির্জায় যাওয়া উচিত এবং মজা করা উচিত।

এখন এ পঙক্তি থেকে দু'টি বিষয় প্রকাশিত। প্রথমত: আখতাল নিজ সম্প্রদায়ের জন্য কোন গির্জা বানিয়েছিল, যেখানে সে এক পাদ্রীবেশে যাতায়াত করতো।

জরুরী মৌলিক বিষয় যা একজন নবীর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। এখন দেখ

টীকার বাকি অংশ ঃ

আর বাহ্যিকভাবে ইঞ্জিল নিজের হাতে নিয়ে লোকদের মেয়ে ও বিবিদের কুদৃষ্টিতে দেখতো এবং তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলতো। দ্বিতীয়ত: এ অবৈধ সম্পর্ককে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা খারাপ মনে করতো না। ফলে এ রকম কুদৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তিকে গির্জা থেকে বহিষ্কার করতো না। আর পাদ্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করতো না। তা না হলে কমপক্ষে তারা এতটুকু তো জানতো ঐ ব্যক্তির হৃদয় অপবিত্র। অপবিত্র অঙ্গ ভঙ্গিমা হৃদয়ে একটা প্রভাব ফেলে। যেহেতু তার নোংরা কবিতা যা গোপন বন্ধুত্ব ও প্রণয়ের প্রমাণ বহন করে এগুলো জাতির নিকট গোপন ছিল না। সেহেতু গোটা জাতি পাপ পঙ্কিলতা ও অনাচারে লিপ্ত ছিল এ ব্যাপারে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে! তাদের গির্জাগুলো পতিতালয়ের ন্যায় ছিল। ফলে ঐ পুরুষ মহিলা যাদের মন্দ চালচলন ও অপবিত্র চিন্তাধারা ছিল তাদের একত্রিত হওয়ার জন্য গির্জার চেয়ে উত্তম আর কোন জায়গা ছিল না। অর্থাৎ তারা গির্জাগুলোতেই প্রবৃত্তির বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ পেত। আর আখতাল শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বাসনা পূরণেই মগ্ন ছিল না বরং সে খ্রিষ্টানদের কোন মহিলা বা মেয়েকেও নিষ্কলুষ মনে করতো না। সুতরাং তার কাব্যগ্রন্থ যার সাথে খ্রিষ্টান গবেষকরা তার জীবনীও প্রকাশ করেছেন। ঐ জীবনীতে এটা লেখা হয়েছে, সে ঐসব মহিলা সংক্রান্ত বিষয়ে একবার দামেস্কের এক গির্জায় বন্দী অবস্থায় ছিল। তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিল, সে খ্রিষ্টান মহিলাদের পূত পবিত্রতা স্বীকার করে না। তথাপি এক অভিজাত ও সম্মানিত মুসলমানের অনুরোধে দামেস্কের প্রধান পাদ্রী তাকে মুক্তি দিয়ে দেয়। কিন্তু আখতাল তার মৃত্যু পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করে নি। আর খ্রিষ্টান মহিলাদের সম্বন্ধে তার কবিতাগুলো আজ পর্যন্ত মুখে মুখে রয়েছে।

ঐ পুস্তকের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় আখতালের জীবনীতে লেখা হয়েছে সে তার কবিতাতে মদের খুবই প্রশংসা করতো এবং সে মদের উপকার সম্পর্কে খুবই জ্ঞাত ও অভিজ্ঞ ছিল। আবার তার জীবনীর ৩৩৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে আখতাল এক খাঁটি খ্রিষ্টান ছিল এবং নিজের ধর্মে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গির্জার উপদেশবাণীগুলো তার খুবই স্মরণ ছিল। ক্রুশকে সর্বদা নিজের বুকে ঝুলিয়ে রাখতো। এজন্য তার নাম জনসমাজে 'ক্রুশওয়ালা' বলে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ পৃষ্ঠায় আরও লেখা আছে সুলতান আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এর দরবারে সে এক সময় চাকুরীতে ছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। তখন সে উত্তর দিল, 'যদি আমার জন্য মদ পান হালাল করে দেন ও রমযানের রোযা মাফ করে দেন, তাহলে আমি মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত'। দেখ! এখনই বলা হয়েছে সে খাঁটি খ্রিষ্টান ও তাকে 'ক্রুশওয়ালা' নামে ডাকা হতো। আর এখন এও লেখা হচ্ছে, ঐ ব্যক্তি এক গ্লাস মদের পরিবর্তে খৃষ্ট ধর্মকে বিক্রি করতেও প্রস্তুত ছিল। বস্তুত: তার জীবনীতে এটা লেখা আছে সে এক মদ্যপায়ী লোক ছিল। আর এ বিষয়টিকে সে নিজের কবিতায় নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে অপরিচিত মহিলাদের থেকে মোটেও সংযমী থাকতে পারতো না। এমন কি সে এটাও স্বীকার করেছে, ঐ যুগে খ্রিষ্টান পুরুষ ও

এই আয়াত কত জোরালোভাবে বলছে, "আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি

টীকার বাকি অংশ ঃ

মহিলাদের সাধারণ চালচলন ভাল ছিল না। এক সুপ্ত মন্দকর্ম তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। হ্যাঁ তার মাঝে এক বড় বীরত্ব এটা ছিল, সে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে খ্রিষ্টানদের পাপ পঙ্কিলতা ও অনাচারকে প্রকাশ করতো ও তাদের গির্জাগুলোকে মন্দকর্মের আস্তানা বলতো। আর নিজের মন্দ কর্মগুলোকে গোপন করে রাখতো না। সুতরাং ঐ পুস্তকের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, একবার আব্দুল মালেক তাকে জিজ্ঞেস করেন– তুমি মদ পান করে কি লাভ করেছো? সে তৎক্ষণাৎ এই দু'টি পঙক্তি আবৃত্তি করে শুনায়-

اذا ما نديمى علنى ثم علنى

ثلث زجاجت لهن هدير

جعلت اجر الذيل منى كاننى

عليك امير المومنين امير

অর্থাৎ মদ পরিবেশনকারিনী যখন এমন তিন বোতলের মদ আমাকে পান করায় যা থেকে মদ ঢালার সময় মধুর এক আওয়াজ হয়। হে আমীরুল মোমেনীন! আমি তখন নেশায় মত্ত হয়ে দম্ভভরে এমনভাবে চলতে থাকি যেন আমি আপনারও আমীর।

যেহেতু ইসলামের নেতৃস্থানীয় কেউ মুসলমান বানানোর জন্য কারও উপর বল প্রয়োগ করেন নি। এজন্য তবলীগ ছাড়া তার প্রতি কোন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয় নি। সে মারওয়ানী সাম্রাজ্যের রাজদরবারে হাজার টাকা পুরস্কার পেত। সে আমাদের প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যুগে জন্ম গ্রহণ করেছিল এবং চার খলীফাগণের (রা.) যুগ সে পেয়েছিল। সে সিরিয়াতে বাস করতো আর অনেক বৃদ্ধ বয়সে মারা গিয়েছিল। সে এটা খুবই উত্তম কাজ করেছে- নিজের কবিতায় খৃষ্ট ধর্মের চালচলনের চিত্রকে অঙ্কন করে দেখিয়েছে। আর অত্যন্ত পরিষ্কার সাক্ষ্য দিয়েছে ঐ যুগের খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা অত্যন্ত অশ্লীল ও মন্দ চালচলনের বেড়া জালে বন্দী ছিল। মদ পান ও প্রত্যেক প্রকারের মন্দ কর্ম তাদের উপর বিজয় লাভ করেছিল। আর যেহেতু সে খৃষ্ট ধর্মের মূল আদি নিবাস ও উৎসস্থল সিরিয়ার বাসিন্দা ছিল এবং সেখানকার চিত্র সে অঙ্কন করেছে। তাতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে প্রায়শ্চিত্তবাদের শিক্ষা কেমন মিথ্যা ও বৃথা প্রবঞ্চনা। প্রাথমিক যুগেই প্রমাণিত হয়েছে, এর প্রভাবে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা প্রত্যেক প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আখতাল এর যুগ হযরত মসীহর যুগ থেকে বেশি দূরে ছিল না। মাত্র ছয় শত বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু আখতাল এর সাক্ষ্য এবং নিজের স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় ঐ যুগের খ্রিষ্টানরা মন্দ চালচলনের দিক থেকে মূর্তিপূজারীদের চেয়েও অনেক বেশি অধপতনে ছিল। যখন কিনা সদ্য আগত যুগেই প্রায়শ্চিত্তবাদ এমন প্রভাব ফেলেছে তখন এ লোকগুলো বড়ই

ওয়া সাল্লাম ততদিন পর্যন্ত পৃথিবী থেকে বিদায় নেন নি যতদিন না

টীকার বাকি অংশ ঃ

নির্বোধ, যারা আজ ঊনিশ শতকে ঐ বৃথা প্রায়শ্চিত্তবাদ থেকে উত্তম কিছু পাবার আশা করে। ঐ যুগের খৃষ্ট ধর্মের রীতিনীতির ব্যাপারে একটি কবিতা 'সাবআ মুয়াল্লাকার' চতুর্থ মুয়াল্লাকায় আমর বিন কলসুম তাগলাবী কর্তৃক লিখিত রয়েছে। আর এটা কোন ঐতিহাসিকের অজানা নয় বানি তাগলাব খ্রিষ্টান ছিল। তারাই সমগ্র আরবের মাঝে অবাধ্যতা, পাপাচার, জুলুম ও বাড়াবাড়িতে সবচে' বেশি অগ্রগামী ছিল। সুতরাং এ কবিতা বানি তাগলাব এর চালচলনের উপর একটা পরিপূর্ণ সাক্ষ্য যে তারা প্রথম সারির খুনী, যুদ্ধোন্মাদ, বিদ্বেষপরায়ণ, পাপাচারী, মদ্যপায়ী ও যৌন বাসনা পূরণের জন্য বৃথা খরচকারী ছিল। তারা নিজেদের পাপ ও অনাচারের বর্ণনা করে গর্ববোধ করতো। আমরা এখানে শুধুমাত্র দু'টি পঙক্তি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখিত বানী তাগলাবের অবস্থার বর্ণনা করে উদ্ধৃত করছি। আর এগুলো সাবআ মুয়াল্লাকার পঞ্চম কবিতায় বিদ্যমান। যার ইচ্ছা দেখে নিতে পারে। তা হলো-

الاهبى بصحنك فاصبحينا

و لا تبقى خمور الاندرينا

و كاس قد شربت ببعلبك

و اخرى فى دمشق و قاصرينا

অর্থাৎ হে মোর প্রিয়তমা! (তার এই প্রিয়তমা মূলত: তার মা-ই ছিল) মদের পিয়ালা নিয়ে ওঠো। "আনদুরিন" শহরে যত রকমের মদ প্রস্তুত হয় ঐ সব আমাকে পান করিয়ে দাও। আর এমন কর মদের ভান্ডারে যেন কোন অবশিষ্টই না থাকে। আবার বলছে, আমি 'বায়ালবাক্কাতে' প্রচুর মদ পান করেছি। তেমনি 'দামেস্কে'ও পান করেছি। 'কাসেরিনে'ও পান করেছি। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, মদ পান করা ছাড়া খ্রিষ্টানদের আর কী কাজই বা ছিল! এমনিতে তো এটা তাদের ধর্মের প্রধানতম অংশ যা আশায়ে রব্বানী (যিশু খৃষ্ট তাঁর হাওয়ারীদের সাথে সর্বশেষ রাতের যে খাবার খান) এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার ছিল খ্রিষ্টানরা নিজেদের আসল মায়ের প্রতিও প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছিল। পাঠকদের জানা থাকে যে "আনদুরিন" সিরিয়ার ছোট্ট একটি শহর। খ্রিষ্টানরা এতে প্রত্যেক প্রকারের মদ বানাত এবং পরে এই মদ অনেক দূর দূরান্তের দেশসমূহে নিয়ে যেত। আর তাদের ধর্মে মদ পান শুধু বৈধই ছিল না বরং হিন্দু ধর্মের বাম মার্গী ফের্কার মত এটা ধর্মের প্রধানতম অংশ ছিল। যা ব্যতীত কোন ব্যক্তি খ্রিষ্টান হতে পারতো না। এজন্য প্রাচীন কাল থেকেই খ্রিষ্টানদের সাথে মদের গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আর এ যুগেও খ্রিষ্টানদের নিকটেই অনেক প্রকারের মদ মওজুদ রয়েছে। এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে আরব দেশেও খ্রিষ্টানরাই মদ নিয়ে এসেছিল এবং দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

ইসলাম ধর্মের ও কুরআনের অবতরণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং হৃদয়সমূহের

টীকার বাকি অংশ ঃ

প্রতীয়মান হয়, মূর্তিপূজার ধ্যান-ধারণাকে যিশু খৃষ্টের পূজার ধ্যান ধারণাই শক্তি যুগিয়েছিল। আর খ্রিষ্টানদের সাহচর্য পেয়েই ঐ লোকেরা সৃষ্টির উপাসনায় অনেক বেশি মগ্নও হয়ে ছিল। স্মরণ যোগ্য, আরবের অসভ্য মরুবাসীরা মদকে চিনতোও না যে এটা কোন সর্বনাশের নাম! কিন্তু খ্রিষ্টানরা যখন সেখানে পৌঁছাল এবং তারা কতিপয় নতুন অনুসারীকে এটা উপহার দিল। তখন এ মন্দ অভ্যাস দেখা দেখি সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নামাযের পাঁচ ওয়াক্তের মত মদ পানের পাঁচটি সময় নির্ধারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ (১) **জাশির**- এটা হচ্ছে ভোরের সূর্যোদয়ের পূর্বের মদ। (২) **সবুহ**- এ মদ সূর্যোদয়ের পর পান করা হয়। (৩) **গাবুক**- এটা যোহর ও আসরের মদের নাম । (৪) **কীল**- দুপুরের মদের নাম। (৫) **ফাহাম**- রাতের মদের নাম। ইসলাম আত্ম প্রকাশ করে, এগুলো পরিবর্তন করে ঐ পাঁচ ওয়াক্তের মদের জায়গায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে নির্ধারিত করে দেয়। প্রত্যেক মন্দের জায়গায় ভালকে নিয়ে আসে। আর সৃষ্টির উপাসনার পরিবর্তে খোদা তাআলার নামকে শিক্ষা দেয়। এই পবিত্র পরিবর্তনকে অস্বীকার করা কেবল মাত্র ভয়ানক কোন বজ্জাতেরই কাজ, সম্ভ্রান্ত কোন মানুষের কাজ এমন নয়। কোন ধর্ম এমন মহান পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে না। আর কখনও পারবেও না। আমরা এখানে খ্রিষ্টানদের সাক্ষ্যমূলক কবিতা থেকেই এ বিষয়টি প্রতিপাদন করেছি। তবুও কেউ যদি আপত্তি করেন তাহলে এ রকম আরো কয়েক শত কবিতা উপস্থাপন করা যাবে। তবে আমার বিশ্বাস এ প্রেক্ষিতে কেউ এটা করবে না। কেননা এ রকম হাজারো কবিতা রয়েছে যা তাদের পাপকর্মের সাক্ষ্যের স্মারক হিসেবে প্রকাশিত। এগুলো তারা কি করে গোপন করতে পারে?

এবার পাদ্রী ঠাকুর দাস সাহেব, কুরআনের অপ্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে অন্যায় ও বিদ্বেষ নিয়ে যিনি মিথ্যা বলেছেন তাকে জিজ্ঞেস করছি, কুরআনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আপনি এখন অবগত হয়েছেন না হন নি? অথবা আমরা কি এটা প্রমাণ করে দিইনি, সমগ্র খ্রিষ্টান জগৎ যখন সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কুরআন ঐ সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদের আকর্ষণে অন্যরাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর নাম প্রকৃত প্রয়োজন , না ওর নাম, যা ইঞ্জিলের জন্য উপস্থাপন করা হয়ে থাকে? যিশু খৃষ্ট মারা গেলেন আর খ্রিষ্টানরা পূর্বের চেয়েও অনেক নিকৃষ্ট হয়ে গেল! ঠাকুর দাস সাহেব যদি চান তবে আমরা দশ হাজার এমন পঙক্তি উপস্থাপন করতে পারবো যাতে বিরুদ্ধবাদীরা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। এখনও অনেক পাপাচারে খ্রিষ্টানরা সবার চেয়ে প্রথম সারিতে রয়েছে। কুকর্মের জননী এই মদের দিকেই দৃষ্টি দিয়ে দেখ, শুধুমাত্র লন্ডন শহরেই মদের এতো দোকান রয়েছে যে, হিসাব নিয়ে দেখা গেছে এগুলোকে যদি এক লাইনে সাজানো হয়, তাহলে ৭৫ মাইল দীর্ঘ হবে। ব্যভিচারীনি মহিলার সংখ্যা ইংল্যান্ডে এতো বেশি যে শুধুমাত্র লন্ডন শহরেই এক লক্ষের অধিক হয়ে গেছে। আর কথিত নিষ্কলুষ নেতাদের বাহাদুরীতে গোপনে জারজ সন্তানের জন্ম হচ্ছে। অনেকে হিসাব করেছেন, এর সংখ্যা

পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। *১ আর এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা কখনই কোন মিথ্যাবাদীকে দেয়া হয় না।

টীকার বাকি অংশ ঃ

শতকরা পঁচাত্তর ভাগ হবে। এটা থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই– জুয়া খেলার তোড়জোড় এতো বৃদ্ধি পেয়েছে মনে হয় ঐ জাতির হৃদয় থেকে আযমতে এলাহী (আল্লাহ্‌র প্রতাপ) সম্পূর্ণরূপে উঠে গেছে। তারা মানুষকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে। মন্দকে পুণ্য মনে করে নিয়েছে। আসল বিষয় হচ্ছে মসীহ্‌র আত্মহত্যার ধারণাই তাদেরকে ধ্বংস করেছে। তওরাতে মন্দ থেকে বাঁচার ও পুণ্যের পথে চলার যে আদেশ নিষেধ ছিল সেটা থেকে প্রায়শ্চিত্তবাদ সবাইকে মুক্ত করে দিয়েছে। ইসলামের সাথে ঐ লোকদের এমন শত্রুতা যেমন সত্যের সাথে শয়তানের। কেউ এটা চিন্তা করে না ইসলাম নতুন কোন বিষয়টি উপস্থাপন করেছে যেটা আপত্তি যোগ্য। মূসা (আঃ) কয়েক লক্ষ নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করেছিলেন কিন্তু কোন খ্রিষ্টান বলে না এটা মন্দ কাজ ছিল। অথচ আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্ত্র ধারণ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে যারা পূর্বে অস্ত্র ধারণ করেছে। তাদেরকে হত্যা করেছেন যারা পূর্বে অনেক মুসলমান হত্যা করেছে। তারপরও তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আক্রমণ করেন নি। বরং যখন কি না তারাই পশ্চাদ্ধাবন করে নিজেরা আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করেছে তখনও বাচ্চাদের হত্যা করেন নি আর বৃদ্ধদেরও না। বরং অপরাধী ছিল যারা তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। এ শাস্তি খ্রিষ্টানদের কাছে খুবই মন্দ মনে হয়। এ নিয়ে সর্বত্র মায়াকান্না করে যাচ্ছে। বিদ্বেষের কারণে তাদের হৃদয় নোংরা হয়ে গেছে।
পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এক সম্মানিত মানুষকে খোদার পুত্র বলতে তাদের শরীর কাঁপে না। বিচার দিবসেরও কোন ভয় নেই। হযরত মসীহ একদিনের জন্য যদি জীবিত হয়ে আসেন আর বলা হয় দেখ এই তোমাদের খোদা! তার সাথে একটু মুসাফা করে নাও! তো লজ্জায় মরে যাবে! হতভাগা সৃষ্টি পূজারীরা এক সম্মানিত বান্দার মৃত্যুর পর তাকে কী কী বানিয়ে বসেছে! কোন লজ্জা নেই! খোদা তাআলার ভয় নেই। এটাও চিন্তা করে না মসীহ পূর্ববর্তী নবীদের চেয়ে বেশি দেখিয়েছেনটা কি? খোদা হিসেবে কি কাজ করেছেন? এটা কি খোদার কাজ ছিল যে সারা রাত জেগে কান্নাকাটি করেছেন, তবুও

টীকা ১ ঃ

খোদা তাআলা কুরআন করীমে সাহাবাদের সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণতা দান করেছি. তোমাদের উপর আমার আশিসসমূহকেও পরিপূর্ণতা দান করেছি। আর আয়াতকে এভাবে উপস্থাপন করেন নি, হে নবী! আজ আমি কুরআনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। এতে হিকমত (গূঢ়তত্ত্ব) ছিল এই যেন প্রকাশ পায় শুধুমাত্র কুরআনই পরিপূর্ণ হয়নি। বরং তাদেরও পরিপূর্ণতা লাভ হয়েছে যাদের কাছে কুরআন পৌঁছানো হয়েছে। আর রিসালতের (নবুওয়তের) আসল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এমন কি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের কোন সত্যবাদী নবীও এতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পরিপূর্ণতার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন নি। একদিকে আল্লাহ্‌র কিতাবও ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করেছে অপর দিকে আত্মার পূর্ণতাও সাধিত হয়েছে। আর অবিশ্বাসীরা সব দিক থেকেই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছে এবং ইসলাম সব দিক থেকে বিজয়ী হয়েছে।

পুনরায় অন্যত্র বলা হয়েছে,*১

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
أَفْوَاجًا ۝
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ
تَوَّابًا ۝

(সূরা নাসর)

অর্থাৎ যখন অবিশ্যম্ভাবী সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া

টীকার বাকি অংশ ঃ

দোয়া কবুল হয়নি। **এলি এলি** বলে জীবন দিয়ে দিয়েছেন, তবুও পিতার কোন দয়া হয় না। অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি। মোজেযার ব্যাপারে পুকুরের কাহিনী কলঙ্কের দাগ দিয়েছে। পন্ডিতরা ধরলো আর খুব ভাল করে ধরলো। কিন্তু কিছুই উপস্থাপন করতে পারলেন না। এলিয়া-র ব্যাখ্যায় কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। আর নিজের বক্তব্য অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করার জন্য এলিয়াকে জীবিত করে দেখাতে পারেন নি। **লিমা সাবাকতানী** বলে অত্যন্ত পরিতাপের সাথে এই জগৎ ত্যাগ করলেন। এমন খোদার চেয়ে তো হিন্দুদের খোদা 'রাম চন্দ্র' শ্রেয়। জীবদ্দশাতেই যিনি রাবনের উপর নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। আর ততক্ষণ পর্যন্ত নিস্তার দেন নি যতক্ষণ পর্যন্ত সে ধ্বংস হয়নি আর তার শহর জ্বালিয়ে দেয়া হয়নি। হ্যা, এ প্রায়শ্চিত্তের প্রতারনা পরে বানিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে দেখা দরকার এতে উপকার কি হয়েছে? খ্রিষ্টানদের উপর তো আরও অনেক বেশি পাপের ভূত চেপে বসেছে। কোন মন্দ কাজ রয়েছে কি যা থেকে তারা বিরত আছে? রয়েছে কি কোন অপবিত্রতা যার শিকলে তারা আবদ্ধ নয়? পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আত্মহত্যাও বৃথা গেছে।

টীকা ঃ১

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে এ অভিপ্রায় অত্যন্ত প্রবল ছিল, আমি নিজের জীবদ্দশাতেই ইসলামকে পৃথিবীতে সুপ্রসারিত দেখে যাব। আর এ বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য ছিল যে, সত্যকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাঁর (সা.) শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ হবে। খোদা তাআলা এ আয়াতে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদ দিয়েছেন, দেখ! আমি তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করে দিয়েছি।

হয়েছিল। আর তুমি দেখেছো, লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করছে। অতএব খোদা তাআলার প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা কর। অর্থাৎ বলে দাও, এসব যা ঘটেছে তা আমার দ্বারা ঘটেনি, বরং তাঁর অনুগ্রহ, দয়া ও সাহায্যেই ঘটেছে। আল বিদায়ী অর্থাৎ পরিপূর্ণতার সাথে চূড়ান্ত ইস্তেগফার কর। কেননা তিনি রহমতের সাথে অনেক বেশি সদয় দৃষ্টিপাতকারী।

ইস্তেগফারের যে শিক্ষা নবীদেরকে দেয়া হয়েছে, এটাকে সাধারণ মানুষের (কৃত) পাপের (জন্য) ইস্তেগফার করার ন্যায় মনে করাটা নির্বুদ্ধিতা। বরং তাদের ক্ষেত্রে এ শব্দ নিজের নগণ্যতা, তুচ্ছতা ও দুর্বলতার স্বীকৃতি এবং সাহায্য প্রার্থনার বিনয়াবনত পন্থা। এ জন্য এ সূরাতে বলা হয়েছে, যে কাজের জন্য আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছিলেন, তা সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর এটা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত ছিল। সুতরাং এর পর এক বছরের মধ্যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু হয়। তাই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতগুলো নাযিল হবার পর যেভাবে খুশী হয়েছিলেন, তেমনি উদ্বিগ্নও হয়ে পড়েছিলেন। কেননা বাগান তো লাগানো হয়েছে কিন্তু এতে সর্বদা পানি সেচের কি ব্যবস্থা হবে? তাই, খোদা তাআলা এই উদ্বিগ্নতা দূর করার জন্য ইস্তেগফারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা অভিধানে মাগফিরাত সেই ঢাকনাকে বুঝায় যার দ্বারা মানুষ বিপদ আপদ থেকে সুরক্ষিত থাকে। এজন্য মিগফার যা হেলমেটকে বুঝায় এ শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। আর মাগফিরাত যাচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে বিপদের ভয় আছে অথবা যে গুনাহর আশংকা আছে, খোদা তাআলা যেন সেই বিপদ বা সেই গুনাহ সংঘটিত না হতে দেন এবং আবৃত করে রাখেন। সুতরাং এই ইস্তেগফারের প্রেক্ষিতে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, এই ধর্মের জন্য দুঃশ্চিন্তা করো না। খোদা তাআলা এটাকে নষ্ট হতে দিবেন না। এর প্রতি

টীকা[১] এর বাকি অংশ ঃ

কম বেশি এ ইচ্ছা সব নবীর থাকলেও যেহেতু এ রকম প্রবল ইচ্ছা ছিল না, তাই মসীহ্ ও মূসা (আ.) কেউই এ সুসংবাদ পাননি। বরং তিনিই পেয়েছেন, যাঁর ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে –

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

অর্থাৎ তুমি নিজের প্রাণকে এজন্য বিনাশ করে ফেলবে যে, এ লোকেরা ঈমান আনছে না।

সর্বদা সদয় দৃষ্টি রাখবেন। আর ঐ সব বিপদাবলীকে প্রতিহত করবেন, যেগুলো কোন দুর্বলতার সময় আপতিত হতে পারে। অধিকাংশ নির্বোধ খ্রিষ্টান মাগফিরাতের প্রকৃত নিগূঢ়তত্ত্ব অনুধাবন করতে না পারার কারণে এটা মনে করে, যে ব্যক্তি মাগফিরাত যাচনা করে সে ফাসেক (দুষ্কৃতকারী) ও গুনাহগার। কিন্তু মাগফিরাত শব্দের উপর গভীরভাবে চিন্তা করলে পরিষ্কার বোধগম্য হবে অবাধ্য ও দুষ্কৃতকারী ঐ লোক, যে খোদা তাআলার নিকট মাগফিরাত কামনা করে না। কেননা যখন কিনা প্রত্যেক প্রকারের সত্যিকারের পরিশুদ্ধতা তাঁর নিকট থেকেই অর্জিত হয়, আর তিনিই প্রবৃত্তির তাড়নার তুফান থেকে সুরক্ষিত ও নিষ্কলুষ রাখেন। তাই, খোদা তাআলার পুণ্যবান বান্দাদের প্রতি মুহূর্তে এটাই করণীয়, তারা যেন ঐ প্রকৃত নিরাপত্তাদানকারী ও নিষ্পাপ সত্তার মাগফিরাত (সাহায্য) কামনা করে। যদি আমরা এই বস্তু জগতে মাগফিরাতের কোন নমুনা অনুসন্ধান করি, তাহলে আমরা এর চেয়ে উত্তম কোন উপমা পাব না যে, মাগফিরাত হচ্ছে ঐ মজবুত ও যথোপযুক্ত বাঁধের ন্যায় যা তুফান ও বন্যাকে প্রতিহত করার জন্য নির্মান করা হয়ে থাকে। তাই, যেহেতু সমস্ত শক্তি, সমস্ত ক্ষমতা খোদা তাআলারই অধিনস্ত এবং যেহেতু মানুষ শারিরীক গঠনে নাজুক, আর আত্মার দিক থেকেও দুর্বল। তাই নিজের বংশলতিকা রক্ষার জন্য সর্বদা ঐ চিরন্তন সত্তার নিকট থেকে পানির প্রত্যাশা করে, যাঁর দয়া ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। এ জন্য আলোচিত অর্থানুসারে ইস্তেগফার পাঠ তার জন্য একান্ত অত্যাবশ্যক। যেভাবে গাছ চারদিকে নিজের শাখা প্রশাখা প্রসারিত করে, যেন আশপাশের ঝরণার দিকে নিজের হাতগুলোকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর আবেদন জানাচ্ছে, হে ঝরণা! আমাকে সাহায্য কর, আমার সজীবতাকে নি:শেষ হতে দিও না এবং আমার ফলের মৌসুমকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করো। এ অবস্থা-ই হয় পুণ্যবানদের ক্ষেত্রেও। আধ্যাত্মিক সজীবতাকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখার জন্য বা এই সজীবতার উন্নতির উদ্দেশ্য প্রকৃত জীবনের ঝরণা থেকে প্রশান্তিদায়ক পানি যাচনা করা এমন এক বিষয়, যাকে কুরআন করীমে অন্য শব্দে 'ইস্তেগফার' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআনকে বুঝে সুঝে একাগ্রচিত্তে পড়। ইস্তেগফারের অতি উচ্চাঙ্গীণ নিগূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে। আমরা এখনই বর্ণনা করে এসেছি, মাগফিরাত আভিধানিকভাবে এমন আচ্ছাদনকে বলে যার মাধ্যমে কোন বিপদ থেকে বাঁচা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, পানি গাছের জন্য এক মাগফিরাতের ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ এর দোষ ত্রুটিগুলো ঢেকে দেয়। এ বিষয়টি চিন্তা কর, যদি কোন

বাগান বছর দুয়েক কোন পানি না পায়, তাহলে এর অবস্থা কি হবে? বাস্তবতা কি এটা নয়, এর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাবে? এর সজীবতা ও অতি সৌন্দর্য্যের নাম নিশানাও থাকবে না? এটা যথা সময়ে কখনও ফল দিবে না। ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাবে। তাতে ফুলও ফুটবে না। এমন কি এর চির সবুজ, নরম, কোমল, তরতাজা পাতাগুলোও কয়েক দিনের মধ্যে শুকিয়ে ঝরে পরে যাবে। আর পরে এই শুষ্কতা কুষ্ঠরোগীর ন্যায় ছড়িয়ে গিয়ে এর সমস্ত শাখা প্রশাখা ধীরে ধীরে খশে পড়া শুরু হয়ে যাবে। এই সব বিপদাবলী তার উপর কেন আপতিত হবে? এই কারণে যে, ঐ পানি যা তার জীবনের কেন্দ্র বিন্দু ছিল সেটা তাকে সিক্ত করেনি। এর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যা আল্লাহ তাআলা বলছেন-

كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

অর্থাৎ পবিত্র বাক্য পবিত্র বৃক্ষের মত। অতএব যেভাবে উত্তম ও উৎকৃষ্ট জাতের বৃক্ষ পানি ছাড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারে না। সেভাবে পুণ্যবান ব্যক্তির পবিত্র মুখনিঃসৃত বাক্যাবলীও নিজে পূর্ণ সজীবতা শক্তি প্রদর্শন করতে পারে না এবং ক্রমোন্নতি লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পবিত্র ঝর্ণাধারা এর শিকড়গুলোকে ইস্তেগফারের স্রোতস্বিণীতে প্রবাহিত হয়ে সিক্ত না করে। সুতরাং মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন ইস্তেগফার থেকেই নিঃসৃত। যার স্রোতধারা দিয়ে (প্রবাহিত হয়ে) প্রকৃত ঝর্ণা মানবতার শিকড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়, শুকিয়ে যাওয়া থেকে, মরে যাওয়া থেকে তা রক্ষা পায়। যে ধর্মে এই দর্শনের উল্লেখ নেই, সে ধর্ম নিশ্চয়ই খোদা তাআলার পক্ষ থেকে আগত নয়। আর যে ব্যক্তি নবী বা রাসূল বা পুণ্যবান বা পবিত্র সত্তা দাবী করে এই ঝরনা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, সে কখনো খোদা তাআলার পক্ষ থেকে (প্রেরিত) নয়। এ রকম ব্যক্তি খোদা তাআলার পক্ষ থেকে নয় বরং শয়তানের পক্ষ থেকে। কেননা 'শায়ত' মরে যাওয়াকে বলে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের আধ্যাত্মিক বাগানকে সজীব রাখার জন্য প্রকৃত সেই ঝরনাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চায় না এবং ইস্তেগফারের স্রোতস্বিণীকে প্রকৃত সেই ঝরনা দ্বারা পূর্ণ করে না, সেই ব্যক্তি শয়তান অর্থাৎ মৃত্যু মুখে পতিত। কেননা, এটা সম্ভব নয়, কোন সতেজ সবুজ বৃক্ষ পানি ছাড়া বাঁচতে পারে। যে অহংকারী এই জীবনের ঝরনা থেকে নিজের আধ্যাত্মিক বৃক্ষকে সবুজ সতেজ করতে চায় না, সে শয়তান এবং শয়তানের মতই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এমন কোন সত্যবাদী নবী পৃথিবীতে

আসেননি যিনি ইস্তেগফারের তত্ত্বজ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন, প্রকৃত ঐ ঝরনা থেকে সজীব হতে চাননি। হ্যাঁ, সর্বাপেক্ষা অধিক এই সজীবতা যাচনা করেছেন আমাদের নেতা অভিভাবক খাতামুল মুরসালীন ফখরে আওওয়ালীন ও আখেরীন মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এজন্য খোদা তাঁকে তাঁর এ সম্পদে সবচে' অধিক সজীব ও সুরভিত করেছেন।

পুনরায় আমরা আমাদের প্রথম বিষয়ে ফিরে গিয়ে লিখতে চাই, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত ও কুরআন করীমের সত্যতার এই দলিল থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে প্রমাণিত হয়, আঁ-জনাব আলাইহিস সালাতো ওয়াস সালামকে এমন এক সময় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, পৃথিবী (নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজেই) যখন আজিমুশ্‌শান এক মুসলেহ (মহান মর্যাদাশীল সংশোধনকারী) এর জন্য প্রার্থনা করছিল। আর তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন নি অথবা নিহত হন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সত্যকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।* নবুওয়তসহ যখন আবির্ভূত হয়েছেন, তো আবির্ভূত হয়েই

***টীকা ঃ**

এখানে স্বাভাবিক একটা আপত্তি উত্থাপিত হয়। এটা হচ্ছে এক মূর্তিপূজারী যদি বলে, আমরা যদিও স্বীকার করছি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে মূর্তিপূজার মূলোচ্ছেদ হয়েছে তথাপি আমরা এটা স্বীকার করি না মূর্তিপূজা বাস্তবিক অর্থে খারাপ ছিল। বরং আমরা বলছি, এটাই সঠিক পথ ছিল যা থেকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাদেরকে) বাধা দিয়েছেন। অতএব এ থেকে বুঝা যায় তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জগতের সংস্কার ও সংশোধন করেন নি বরং যোগ্যতা (বিকাশের) পথকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এভাবে যদি এক অগ্নিপূজারী বলে, আমি এটা মানি বাস্তবিক অর্থে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগ্নিপূজার রীতিকে বিলুপ্ত করেছেন। সূর্য্য পূজাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি এ বিষয় মানবো না, তিনি এ কাজটা ভাল করেছেন। বরং সেটাই সত্যিকার রাস্তা ছিল যা মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে যদি এক খ্রিষ্টান বলে, যদিও মেনে নিচ্ছি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব থেকে খৃষ্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তিকে উপড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু আমি এ বিষয়টিকে সংশোধনের তালিকাভুক্ত করতে পারছি না যে, ঈসা ও তার মাতার পূজাকে নিষিদ্ধ করা, ক্রুশ ও মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলা এটা ভাল কাজ হয়েছে। বরং ঐ রাস্তাই ভাল ছিল যার বিরোধীতা করা হয়েছে। এভাবে যদি জুয়ারী, মদখোর, ব্যভিচারী, মেয়েদের হত্যাকারী, কৃপন বা অযথা খরচকারী, বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার ও খেয়ানতকারী, চোর, ছিঁচকে চোর ও ডাকাত নিজ নিজ দলিল পেশ করে এবং বলে,

চলমান টীকা

তিনি তাঁর প্রয়োজনীয়তাকে জগতের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেক জাতিকেই নিজেদের শিরক্, অসাধুতা, অনাচার ও অপকর্মের জন্য অভিযুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে কুরআন করীমে বহু বিবরণ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এ

(টীকার বাকী অংশ)

যদিও আমরা স্বীকার করছি ও মেনে নিচ্ছি, ইসলাম আমাদের দলের অনেক উত্তম সংস্কার করেছে। আর হাজারো চোরকে কঠিন শাস্তি দিয়ে ধরাপৃষ্ঠের এক বিরাট অংশ থেকে তাদের অনিষ্ট ও মন্দ কর্মকে মিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে তাদের উপর অন্যায়ভাবে জুলুম করা হয়েছে। ওরা জীবন বাজি রেখে চুরি করে। নিজেদেরকে বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় রেখে ডাকাতী করে। অতএব তাদের এতো পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হালালের আওতার মধ্যেই পরে। অন্যায়ভাবে তাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে। এক পুরাতন রীতি যা ইবাদতের মধ্যে গণ্য হতো সেটাকে মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ দলগুলোর উত্তর এটাই হবে। এমন কি ঐ দলগুলোর মধ্যে কোন ব্যক্তিই নিজের মুখে নিজের দোষত্রুটিকে স্বীকার করবে না। কিন্তু তাদের একে অন্যের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি যে শ্রী রামচন্দ্র ও শ্রী কৃষ্ণের পূজা করে। তাদেরকে ইশ্বর বলে সম্বোধন করে, সে এটা থেকে কখনও বিরত থাকবে না। সে শ্রী রামচন্দ্র ও শ্রী কৃষ্ণকে কখনও মানুষ বলে মানতে চাইবে না। বরং সে এ কথার উপর বার বার জোর দিবে এই দুই মহান সত্তার উপর পরম আত্মার জ্যোতি ছিল। এ কারণে তারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, ইশ্বরও ছিলেন। তারা নিজের মাঝে সৃষ্টির একটা রূপ রাখতেন আর স্রষ্টারও। সৃষ্টির রূপটা ছিল ক্ষণস্থায়ী। তেমনি সৃষ্টির দুর্বলতাগুলো অর্থাৎ মৃত্যু বরন করা, দুঃখ পাওয়া অথবা খাওয়া, পান করা সবই ছিল ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তাদের স্রষ্টার রূপ হচ্ছে চিরস্থায়ী আর স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যগুলোও চিরস্থায়ী। কিন্তু যদি তাদেরকে বলা হয়, এ বিষয়টি যদি যথার্থ হয় তাহলে ইবনে মরিয়ম এর ইশ্বরত্বকেও মেনে নাও। বেচারা খ্রিষ্টানরা যারা দিন রাত এ চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের প্রতিও কিছুটা দৃষ্টি দাও। তখন তারা হযরত মসীহকে এমন অশোভনীয় ভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার ঈশ্বরত্বকে মানা তো দূরের কথা–তার নবুওয়তকেই অস্বীকার করে বসে। এমনকি অনেক সময় গালমন্দও দিয়ে থাকে। আর বলে শ্রী মহারাজ পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তি শ্রী রামচন্দ্র, শ্রী কৃষ্ণ রুদ্র গোপালের সাথে তার কি তুলনা? 'ও' তো একজন মানুষ ছিল যে মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করেছিল। কোথায় শ্রী মহারাজ কৃষ্ণ আর কোথায় মরিয়ম এর পুত্র! আর আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে, যদি খ্রিষ্টানদের নিকট এই দুই মহাত্মা অবতারের উল্লেখ করা হয় তাহলে তারাও ওদের ইশ্বরত্বকে মানে না। বরং অভদ্রতার সাথে কথাবার্তা বলে। যদিও পৃথিবীতে সর্ব প্রথম ইশ্বরত্বের মর্যাদা এই দুই বুযুর্গ পেয়েছেন আর তারাই সমস্ত ছোট ছোট ইশ্বরের প্রধান পূর্বসূরী। ইবনে মরিয়ম ও অন্যরা তো পরে এসেছেন এবং সেটারই শাখা প্রশাখা।

চলমান টীকা

আয়াতের উপর চিন্তা করে দেখ যা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন-

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ
لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ

(সূরা ফুরকান ঃ ২)

(টীকার বাকী অংশ)

খ্রিষ্টানরা মসীহকে ইশ্বর বানানোতে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে যারা ইতিপূর্বেই তাদের মহান ব্যক্তিদেরকে ইশ্বর বানিয়েছে। যে ভাবে কুরআন করীম এদিকে ইঙ্গিত করছে। দেখ আয়াত-

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ
النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ
بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى
يُؤْفَكُوْنَ ۝

(সূরা তওবা ঃ ৩০)

অর্থাৎ ইহুদীরা বলে উযায়ের খোদার পুত্র আবার খ্রিষ্টানরা বলে মসীহ খোদার পুত্র। এ সবই তাদের মুখের কথা। তারা ঐ লোকদের নকল করছে যারা ইতিপূর্বে মানুষকে খোদা বানিয়ে অস্বীকারকারী হয়েছিল। আল্লাহ্র মার কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়ছে!

সুতরাং এ আয়াত হিন্দু ও গ্রীকদের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে । বলা হচ্ছে পূর্বে এই লোকেরা মানুষকে ইশ্বর আখ্যায়িত করেছে। পরে খ্রিষ্টানদের দুর্ভাগ্যবশত: এ দর্শন তাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। তখন তারা বললো আমরা কেন ঐ জাতীদের থেকে পিছনে পড়ে থাকবো? কিন্তু এটা তাদের দুর্ভাগ্য, তওরাতে পূর্ব থেকেই এ বাগধারা ছিল- মানুষকে বিভিন্ন স্থানে খোদার পুত্র আখ্যায়িত করা হয়েছে, এমন কি কন্যাও। শুধু তাই নয়, অনেক মৃত লোককে ইশ্বরও বলা হয়েছে। এই সাধারণ বাগধারা অনুসারে ইঞ্জিলে মসীহর জন্যও একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ শব্দই নির্বোধদের জন্য বিনাশকারী বিষে পরিণত হয়েছে। সমগ্র বাইবেল দোহাই দিচ্ছে এই শব্দ শুধুমাত্র ইবনে মরিয়ম এর জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়নি বরং প্রত্যেক নবী ও পুণ্যবান ব্যক্তির জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। বরং ইয়াকুবকে আদি পুত্র বলা হয়েছে।

কিন্তু দুর্ভাগা মানুষ কোন কিছুতে যখন ফেঁসে যায় তখন এর থেকে বের হতে পারে না। আবার উদ্ভূত বিষয় হচ্ছে, মসীহর ইশ্বরত্বের জন্য যে সব বিধানাবলী বর্ণনা করা হয়েছে– সে ইশ্বর, আবার মানুষও। এসব বিধানাবলী শ্রী কৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জন্য হিন্দুদের

চলমান টীকা

অর্থাৎ তিনি অফুরন্ত আশিসের অধিকারী যিনি কুরআনকে তাঁর বান্দার উপর এ জন্য নাযেল করেছেন যেন এটা সারা জগতের প্রতি সতর্ককারী হতে পারে অর্থাৎ তাদের বিপথগামীতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য তাদেরকে সর্তক করে দিতে

(টীকার বাকী অংশ)

গ্রন্থসমূহে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। আর এই নতুন শিক্ষা এর সাথে এতোই সাদৃশ্যপূর্ণ, এ ব্যাপারে আমরা এই সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ করতে পারছি না যে এগুলো হিন্দুদের বিশ্বাসকে নকল করেই করা হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে ত্রিমূর্তির প্রতিও বিশ্বাস রয়েছে, যা ব্রাহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের সমষ্টি। অতএব ত্রিত্ববাদ এ রকম একটি বিশ্বাসের-ই প্রতিচ্ছবি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে মসীহকে ইশ্বর বানানোর জন্য এবং যুক্তির নিরিখে উত্থাপিত আপত্তিমসূহ থেকে বাঁচার জন্য খ্রিষ্টানরা যা কিছু জোড়াতালি দেয় এর উদ্দেশ্য হলো মসীহর মনুষ্যত্বকে ইশ্বরত্বের সাথে গুলিয়ে ফেলে তারা যুক্তি যুক্ত আপত্তিসমূহ থেকে বাচঁতে চায়। তবুও শেষ পর্যন্ত তারা কোনভাবেই বাঁচতে পারে না। মাথা প্রকৃত উপাস্যের নিকট ঝুঁকিয়ে পিছুই হটতে হয়। হুবহু এ চিত্র হিন্দুদেরও যারা রামচন্দ্র ও কৃষ্ণকে ইশ্বর আখ্যা দিয়েছে। অর্থাৎ তারাও হুবহু ঐ কথাই শুনায় যা খ্রিষ্টানরা শুনিয়ে থাকে। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে যখন আটকে যায়। তখন বলে- এটা ইশ্বরের এক রহস্য এবং এটা তাদের জন্য উন্মোচন করা হয় যারা 'যোগ' অর্জন করে এবং জগতকে ত্যাগ করে ও তপস্যা করে। কিন্তু এই লোকেরা জানে না এ রহস্য তো ঐ সময়-ই উন্মোচন হয়ে গেছে যখন ঐ মিথ্যা ইশ্বরগুলো নিজেদের ইশ্বরত্বের এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে নি যা মানুষ দেখাতে অক্ষম। সত্য কথা হচ্ছে এ কিচ্ছা কাহিনীতে গ্রন্থাবলী পূর্ণ রয়েছে- ঐ অবতারগণ অনেক 'শক্তির' কাজ করেছেন। মৃতদেরকে জ্বালিয়েছেন, পাহাড়কে মাথায় উঠিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা যদি ঐ কাহিনীগুলোকে সত্য মেনে নিই, তাহলে ঐ সকল লোক নিজেরাই মেনে নেয় ঐ অলৌকিক ঘটনাবলী এমন কিছু লোকও দেখিয়েছে যারা ইশ্বরত্ব দাবী করে নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছুটা চিন্তা করে দেখ মসীহর কাজ কি মূসার চেয়ে বড় ছিল? বরং পুকুরের ঘটনা তো মসীহর নিদর্শনাবলী– মাটিতেই মিশিয়ে দিয়েছে। আপনারা কি অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনকারী পুকুর যা ঐ যুগে ছিল তা সম্পর্কে অবগত নন! ইসরাইলীদের মধ্যে এমন নবী কি গত হননি যাদের শরীরের স্পর্শে মৃত জীবিত হতো? এরপরও ইশ্বরত্বের (দাবী করার) আস্ফালনের কোন কারণ আছে কি! লজ্জা ! লজ্জা!!

আর যদিও হিন্দুরা নিজেদের অবতারদের সম্পর্কে 'শক্তিধর কাজে' অনেক কাহিনী লিখে এবং যত্র তত্র তাদেরকে পরমেশ্বর সাব্যস্ত করতে চায়। কিন্তু এ কাহিনীগুলোও খ্রিষ্টানদের বেহুদা কাহিনীগুলোর চেয়ে কোন দিক দিয়ে কম যায় না। যদি ধরেও নেওয়া হয় এর মধ্যে কিছু সঠিকও রয়েছে, তবুও দুর্বল মানুষ যে অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতার উপাদান থেকে সৃষ্ট সে পরমেশ্বর হতে পারে না। এভাবে অবিনশ্বর হওয়ার দাবী এমনিতেই অপনোদন

চলমান টীকা

পারে। অতএব, এ আয়াত এ বিষয়ের পক্ষে একটা দলিল। কুরআনেরও দাবী এটাই, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সময়ে আগমন করেছিলেন যখন সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত জাতি কলুষিত হয়ে পড়েছিল। বিরুদ্ধ

(টীকার বাকী অংশ)

হয়ে যায়। আর এটা ঐশী কিতাবেরও পরিপন্থী। তবে হ্যা, 'অলৌকিক জীবিত' হওয়া যাতে পৃথিবীতে ফিরে এসে পুনরায় বসতি স্থাপন বুঝায় না, তা সম্ভব। কিন্তু এটা ইশ্বরত্বের দলিল নয়। কেননা, এরূপ দাবীকারক রয়েছেন অনেকে। মৃতের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দিয়েছেন এমন অনেকে গত হয়েছেন। কিন্তু এর পদ্ধতিটা হচ্ছে কাশফে কবরের (কবরে শায়িত ব্যক্তির সাথে কাশফে কথা বলা) ন্যায়। হ্যাঁ, নি:সন্দেহে খ্রিষ্টানদের উপর হিন্দুদের একটা শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সন্দেহাতীতভাবে আমরা এটা প্রমাণ করতে পারি হিন্দুরা বান্দাকে ইশ্বর বানানোতে খ্রিষ্টানদের পথিকৃৎ ছিল। খ্রিষ্টানরা তাদেরই আবিষ্কারের অনুসরণ করেছে। আমরা কোন ভাবেই এই বিষয়টিকে গোপন রাখতে পারছি না, যুক্তি ভিত্তিক আপত্তি থেকে বাঁচার জন্য খ্রিষ্টানরা যে সব বিষয় বানিয়েছে তা তাদের নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত নয় বরং হিন্দু শাস্ত্র ও গ্রন্থ থেকে চুরি করে নেয়া হয়েছে। এসব গুরুতর মিথ্যা অপব্যাখ্যা ব্রাহ্মণরা পূর্ব থেকেই শ্রী কৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছিল যেগুলো খ্রিষ্টানদের কাজে লেগেছে। সুতরাং এই চিন্তা ধারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি হিন্দুরা হয়তো খ্রিষ্টানদের কিতাবসমূহ থেকে এসব চুরি করেছে। কেননা তাদের এ রচনাসমূহ ঐ সময়ের যখন হযরত ইসা (আ.) এর অস্তিত্বও এ পৃথিবীতে ছিল না। অতএব অবধারিতভাবে মানতে হয় খ্রিষ্টানরাই চোর। সুতরাং পোর্ট সাহেবও এ বিষয়ের বিশ্বাসী- ত্রিত্ববাদ, প্লেটোর এক ভুল চিন্তার অনুসরণের পরিণতির ফল। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হচ্ছে গ্রীক ও ভারতবর্ষ নিজেদের ধ্যান-ধারণায় পরস্পর একই রকম ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, এই শিরকের সমস্ত স্তুপ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ থেকে 'বেদ বিদ্যার' আকৃতিতে গ্রীকে পৌঁছায়। পরে সেখান থেকে নির্বোধ খ্রিষ্টানরা চুরি করে ইঞ্জিলে সংযোজন করেছে আর নিজেদের ষোল কলা পূর্ণ করেছে। এখন আমি মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে লিখছি এই সব মতাবলম্বীর মাঝে এক দল অপর দলের অস্বীকারকারী। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই. প্রত্যেক দল স্ব স্ব ধারণা অনুসারে অন্যদের বিশ্বাস মিটিয়ে দেয়ার মধ্যেই জগতের সংশোধনের একমাত্র রাস্তা খুঁজে পায়। আর তারা এটা মনে করে তাদের বিরুদ্ধবাদীদের বিশ্বাস খুবই মন্দ ও ভ্রান্ত। অতএব প্রত্যেক দলই যখন নিজেদের বিরোধীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাদের মন্দকে মেনে নিচ্ছে ঠিক তখন এমন অবস্থাতেই প্রত্যেক দলকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে অবশ্যম্ভাবীরূপে স্বীকার করতে হবে সত্যিকার অর্থে তাঁর (সা.) মাধ্যমে জগতের ব্যাপক সংস্কার ও সংশোধন সাধিত হয়েছে। তিনিই সত্যিকার মুসলেহ আযম (সবচেয়ে বড় সংশোধনকারী) ছিলেন। এছাড়া প্রত্যেক দলের গবেষকগণ এ বিষয়টি স্বীকার করেন ঐ যুগে বাস্তবিক অর্থেই তাদের ধর্মের অনুসারীরা মন্দ চালচলন ও অসৎ পথে নিমগ্ন ছিল। সুতরাং ঐ

চলমান টীকা

জাতিগুলো এ দাবীকে শুধুমাত্র তাদের মৌনতা দিয়ে নয় বরং নিজেদের স্বীকারোক্তি দ্বারাও মেনে নিয়েছে। অতএব এ থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত এটাই দাঁড়ায় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তবিক অর্থেই এমন এক

(টীকার বাকী অংশ)

যুগের মন্দ চালচলন ও খারাপ অবস্থা সম্পর্কে পাদ্রী ফিন্ডেল 'মিযানুল হক' এ এবং গবেষক পোর্ট নিজের পুস্তকে এবং পাদ্রী জেমস কেরনেল্‌স মে ১৮৮২ তে নিজের প্রদত্ত বক্তব্যে স্বীকার করেছেন। এছাড়াও প্রকৃত সাধু ও পুণ্যবান ব্যক্তি জানেন, এ সমস্ত দল অন্ধকারের অতল গহব্বরে নিমজ্জিত রয়েছে।* আর যাদেরকে ঐ নির্বোধরা ইশ্বর মনে করছে তাদের কেউ-ই প্রকৃত ও সত্য ইশ্বর নয়। কেননা বাস্তবিক অর্থে ইশ্বর হলে তার লক্ষণাবলী এটা হতো- তার মহিমা ও প্রতাপ তার জীবনের ঘটনাবলী দ্বারা এমনভাবে প্রকাশ পেত যেভাবে আকাশ ও পৃথিবী এক সত্য ও প্রতাপশালী খোদার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্বল ও বিপদগ্রস্থ এ ইশ্বরদের মধ্যে সে লক্ষণাবলী মোটেও নেই। কোন বুদ্ধিমান কি এ বিষয়টিকে মেনে নিবে মৃত ও দুর্বল কোন ব্যক্তি কোন এক দিক থেকে ইশ্বরও। কখনও নয়। বরং সত্য খোদা ঐ খোদা-ই যার অপরিবর্তনীয় গুণাবলী আদি থেকে জগতের আয়নায় দৃষ্টি গোচর হয়ে আসছে এবং তাঁর এটার প্রয়োজন নেই কেউ তাঁর পুত্র হোক আর আত্মহত্যা করুক যাতে এর দ্বারা লোকেরা মুক্তি লাভ করে। বরং মুক্তি লাভের আসল পন্থা আদি থেকে একই যা নতুনত্ব ও কৃত্রিমতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, যার মধ্যে পরিচালিত হওয়া ব্যক্তি সত্যিকার মুক্তি লাভ করে ও এর ফলফলাদীও এ নশ্বর পৃথিবীতেই পেয়ে থাকে। এর সত্যিকার দৃষ্টান্ত সে নিজের অভ্যন্তরে দেখে। অর্থাৎ এর সত্যিকার পথ এটাই ঐশী আহবানকারীকে গ্রহণ করে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এমন ভাবে চলতে হবে যেন নিজের আত্মসত্তা মরে গেছে আর এভাবে নিজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে, এটাই হচ্ছে ঐ পথ যা খোদা তাআলা সূচনা থেকেই, মানুষকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছে (তখন থেকেই) সত্যান্বেষীদের প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন। এই আত্মিক কুরবানীর উপকরণ তাদেরকে দান করা হয়েছে এবং তাদের প্রকৃতি (স্বভাব) এই উপকরণকে নিজের সাথেই নিয়ে এসেছে। আর এরই প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করানোর জন্য বাহ্যিক কুরবানীসমূহও রাখা হয়েছে। এটা হচ্ছে সেই সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান–যেটাকে নির্বোধ, দুর্ভাগা হিন্দু ও খ্রিষ্টানরা বুঝতে পারেনি এবং এ আধ্যাত্মিক নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি গভীর চিন্তা ভাবনা করে নি। বরং অতি মন্দ, ঘৃণ্য ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারনায় নিমগ্ন হয়ে গেছে। আমি কখনও কোন বিষয়ে

চলমান টীকা

নোট :

এ সাক্ষ্য পন্ডিত দয়ানন্দও তার 'সত্যার্থ প্রকাশ' এর মাঝে দিয়েছেন। আর পন্ডিত জ্বী এতে স্বীকার করেছেন ভারতবর্ষ ঐ যুগেই মূর্তি পূজায় নিমজ্জিত ছিল।

সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন একজন সত্য ও পরিপূর্ণ নবীর আগমনের প্রয়োজন ছিল। আবার আমরা যখন অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কখন ফিরে যেতে বলা হয়েছিল? তাহলে

(টীকার বাকী অংশ)

এতো আশ্চর্যান্বিত হইনি যতটুকু এই লোকদের অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। যারা পরিপূর্ণ, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব খোদাকে পরিত্যাগ করে এমন বৃথা চিন্তা-ভাবনার অনুসরণ করে এবং এটাকে নিয়ে গর্ববোধ করে।

আবার আমরা মূল বিষয়ে ফিরে এসে বলছি, যেভাবে আমরা বর্ণনা করে এসেছি– আমাদের নেতা ও অভিভাবক আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্কার ও সংশোধন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক, সার্বজনীন ও সর্বজনস্বীকৃত। এতো উচ্চ পর্যায়ের সংস্কার ও সংশোধন পূর্বের কোন নবীর দ্বারা-ই সম্ভব হয়নি। কেউ যদি আরবের ইতিহাস সামনে রেখে চিন্তা করে তাহলে সে বুঝতে সক্ষম হবে সেই যুগের মূর্তিপূজারী, খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা কেমন গোড়া (ধর্মান্ধ) ছিল! আর যারা শত শত বছর যাবৎ হতাশায় পর্যবসিত ছিল তাদেরকে কেমন (উত্তম ভাবে) সংশোধন করা হয়েছিল। আবার চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের শিক্ষা যা সম্পূর্ণরূপে তাদের বিরোধী ছিল, তা তাদের উপর কেমন সুস্পষ্ট কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। কিভাবে প্রত্যেকটি মিথ্যা ধর্মমত ও প্রত্যেকটি মন্দকর্মকে সমূলে বিনাশ করেছিল। মদ যা সকল কুকর্মের জননী তা বিদূরিত করা হয়েছিল, জুয়া খেলার কৃষ্টিকে মিটিয়ে ফেলা হয়েছিল, কন্যা হত্যার প্রথার মূলোৎপাটন করা হয়েছিল। আর যা কিছু মানবীয় দয়া, সুবিচার ও পবিত্রতার পরিপন্থী অভ্যাস ছিল তা সবই সংশোধন করা হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, অপরাধীরাও তাদের অপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি পেয়েছিল। সুতরাং এ সংস্কার ও সংশোধনের বিষয়টি এমন এক বিষয় ছিল, যা কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য, এ যুগের অনেক সত্য গোপনকারী পাদ্রী যখন দেখেছেন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এমন সার্বজনীন সংস্কার ও সংশোধন সাধিত হয়েছে যে এটাকে কোনভাবেই গোপন করা সম্ভব নয়। অপরদিকে এর বিপরীতে মসীহ তার যুগে যে সংস্কার ও সংশোধন করেছেন তা অতি নগন্য। তখন এ সব পাদ্রীরা চিন্তায় পড়ে যায় পথভ্রষ্টতার স্রোতধারাকে সংশোধন করা এবং পাপীদেরকে সাধুতার রঙে রঙিন করা, যা সত্য নবীর আসল লক্ষণ এটা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে যেভাবে পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়েছে এর সাথে মসীহর সংস্কার ও সংশোধন, কোন তুলনাই হয় না। তখন তারা নিজেদের দাজ্জালী প্রতারণার মাধ্যমে সূর্যের উপর ছাইনিক্ষেপ করতে চাইলো। তাই বেচারা পাদ্রী জেমস কেরনলেস নিজের বক্তব্যে প্রকাশ করলো, অজ্ঞদেরকে এভাবে ধোঁকা দেয়া হলো যেন এ লোক পূর্ব থেকেই যোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত ছিল এবং মূর্তিপূজা ও শিরক তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত হিসেবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু এমন মত প্রকাশকারী যদি নিজের ধ্যান-ধারণা সঠিক মনে

চলমান টীকা

আমরা দেখতে পাই, কুরআন আমাদেরকে স্পষ্ট ও বিশদভাবে খবর দিচ্ছে- এমন এক সময়ে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যখন তিনি তাঁর কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। অর্থাৎ ঐ সময়ের পরে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছিল যখন এ

(টীকার বাকী অংশ)

করেন তাহলে তার জন্য আবশ্যকীয়, তিনি তার এ ধ্যান-ধারণার সমর্থনে এমনই প্রমাণ যেন উপস্থাপন করেন, কুরআন করীম তাদের বিরুদ্ধে যেমন প্রমাণ পেশ করেছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে-

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে মৃত আখ্যায়িত করে তাদের জীবিত করাকে শুধুমাত্র নিজের দিকে আরোপিত করে সর্বত্র ঘোষণা দিচ্ছে- তারা পথভ্রষ্টতার শিকলে আবদ্ধ ছিল। আমরাই তাদের নিষ্কৃতি দিয়েছি। তারা অন্ধ ছিল আমরাই তাদেরকে চক্ষুষ্মান করেছি। তারা অন্ধকারে ছিল আমরাই তাদেরকে নূর (আলো) দান করেছি। আর এ বিষয়গুলো অপ্রকাশিত ছিল না বরং কুরআন সবার নিকট তা পৌঁছিয়েছিল। তারা এ বর্ণনাগুলোকে অস্বীকার করেনি। কখনও এটা প্রকাশ করেনি আমরা তো পূর্বেই প্রস্তুত ছিলাম, আমাদের প্রতি কুরআনের কোন অনুগ্রহ নেই। অতএব যদি আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের নিকট নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে এবং যা কুরআন করীমে তেরশ বছর থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে এর পরিপন্থী কোন লিখা থাকে, তাহলে সেটা প্রকাশ করে দিক। নতুবা এ ধরনের কথাবার্তা শুধু মাত্র খৃষ্টানী ধারার মিথ্যা রটনা হবে, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এটা তো জেমস এর কথা যা "কিতাবে মাযহাবে আলম" (পৃথিবীর ধর্মসমূহ) পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কিছু খ্রিষ্টান পাদ্রী এর থেকেও অগ্রসর হয়ে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন! তারা বলছেন, বাস্তবিক অর্থে সংস্কার ও সংশোধন কোন জিনিস-ই নয়। আর না কারও কখনও কোন সংশোধন হয়েছে। তওরাতের শিক্ষা সংশোধনের জন্য ছিল না। বরং এই ইঙ্গিতের জন্য ছিল- পাপী মানুষ খোদার বিধি-নিষেধের উপর চলতে পারে না। আর ইঞ্জিলের শিক্ষাও এই উদ্দেশ্যেই ছিল। নতুবা চড় খেয়ে অন্য গাল পেতে দেওয়া- এটা না কখনও হয়েছে আর না কখনও হবে। বলা হয়–মসীহ কি কোন নতুন শিক্ষা নিয়ে এসেছেন? আবার তারাই উত্তর দিচ্ছেন- ইঞ্জিলের শিক্ষা তো পূর্ব থেকেই তওরাতে বিদ্যমান ছিল। তওরাতের ছড়ানো ছিটানো অংশ একত্রিত করেই ইঞ্জিল হয়েছে। তাহলে মসীহ কেন আসলেন? এর উত্তর দেয়- শুধু মাত্র আত্মহত্যার জন্য। কিন্তু অবাক হতে হয়- আত্মহত্যা থেকেও মসীহ্ বাঁচার জন্য চেষ্টা করেছেন! আর নিজ মুখে বলেছেন -**এলী এলী লিমা সাবাকতানী**। আবার এটাও একটা অদ্ভুত বিষয়, যায়েদের আত্মহত্যায় বকরের কি উপকার হবে! যদি কারও কোন আত্মীয় তার ঘরে অসুস্থ হয় আর সে তার কষ্ট দেখে নিজের গায়ে ছুরি দিয়ে আঘাত করে তাহলে কি এই অনর্থক কাজে তার আত্মীয় সুস্থ হবে ? অথবা উদাহরণ স্বরূপ, কারও ছেলের যদি পেটে ব্যথা হয়, আর তার কষ্টে তার পিতা যদি নিজের মাথা পাথর মেরে ফাটিয়ে ফেলে তাহলে কি তার এ নির্বোধ কাজে তার পুত্র ভাল হয়ে যাবে?

এটাও বোধগম্য হচ্ছে না যায়েদ কোন পাপ করলো আর তার পরিবর্তে বকরকে ক্রুশে চড়ানো হলো এটা ন্যায় বিচার হবে, না দয়া প্রদর্শন করা হবে?

চলমান টীকা

আয়াত নাযেল হয়েছিল যে মুসলমানদের জন্য শিক্ষার যাবতীয় বিষয় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আর ধর্মের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু অবতীর্ণ হবার ছিল সবই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। শুধু এটাই নয়, বরং এ সংবাদও দেয়া হয়েছিল খোদা তাআলার সাহায্য ও সহযোগিতাও পরিপূর্ণ মাত্রায় পৌঁছে গেছে। লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করছে। আর এ আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে পাপ পঙ্কিলতার প্রতি নিরুৎসাহিত করেছেন। তাদেরকে পবিত্র ও নেক গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন। তাদের চরিত্র, আচার আচরণ ও আত্মায় এক অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এ সব কিছু ঘটে যাওয়ার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা নাসর। যার বক্তব্য হলো - নবুওয়তের সমস্ত উদ্দেশ্যে সাধিত হয়ে গেছে। ইসলাম মানুষের হৃদয়কে জয় করেছে। তখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন এ সূরা আমার মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করছে। এমন কি এরপর তিনি হজ্জ করেন এবং এই হজ্জেরই নাম হাজ্জাতুল বিদা (বিদায় হজ্জ)। আর তিনি হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে এক উটনীর পিঠে বসে এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বলেন, হে খোদার বান্দারা ! শুন! আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার প্রতি এ নির্দেশ ছিল, আমি যেন সমস্ত আহকাম (শরীয়তের বিধি-নিষেধ) তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই। অতএব তোমরা কি আজ এ সাক্ষ্য দিতে পার, তোমাদেরকে এ সমস্ত বিষয় আমি পৌঁছে দিয়েছি। সমগ্র জাতি তখন উচ্চস্বরে প্রত্যয়ণ করলো, হ্যাঁ, এ সমস্ত সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আকাশের দিকে মুখ তুলে তিন বার বললেন, হে খোদা! তুমি এ কথার সাক্ষি থেকো। তিনি আবার বললেন, আমি সমস্ত কথা এ জন্য তোমাদেরকে বিস্তারিতভাবে বললাম, হতে পারে, আগামী বছর আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারব না। পুনরায় তোমরা আর আমাকে এ স্থানে পাবে না। তারপর মদীনা ফিরে গেলেন এবং পরের বছর ইন্তেকাল করলেন।

(টীকার বাকী অংশ)

কোন খ্রিষ্টান এটা আমাদের অবগত করবেন কি? আমরা এটা স্বীকার করি খোদার বান্দাদের কল্যাণার্থে প্রাণ বিসর্জন দেয়া বা প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত থাকা এক উন্নত চারিত্রিক অবস্থা। কিন্তু এটা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা হবে যদি আত্মহত্যার বৃথা কর্মকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এমন আত্মহত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর এটা নির্বোধ ও ধৈর্য্যহীনদের কাজ। হ্যাঁ, আত্মত্যাগের পছন্দনীয় পন্থা এই সুমহান পরিপূর্ণ সংস্কারক ও সংশোধনকারীর জীবনীতে দীপ্তিমান রয়েছে যাঁর নাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

اللهم صل عليه وبارك وسلم

বস্তুত : এসব কিছুর ইশারা ইঙ্গিত কুরআন করীমে বিবৃত ছিল। আর এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে চলেছে ইসলামের ইতিহাস।

আজ পৃথিবীতে কোন খ্রিষ্টান অথবা ইহুদী অথবা আর্য নিজেদের এমন কোন সংস্কারককে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করতে পারবে কি, যাঁর আগমন হয়েছিল সার্বজনীন ও অতি প্রয়োজনের সময়ে এবং তাঁর প্রত্যাগমন হয়েছিল এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার পর আর যাদের নিকট তাকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল ঐ বিরোধীরা নিজেদের অপবিত্র ও অসৎ কার্যকলাপের কথা স্বীকার করেছিল? আমি জানি এই প্রমাণ ইসলাম ছাড়া কারো কাছে নেই। আমরা সবাই জানি, হযরত মূসা (আ.) কে প্রেরণ করা হয়েছিল শুধুমাত্র ফেরাউনকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাঁর স্বজাতিকে মুক্ত করার জন্য এবং তাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য। সারা জগতের ফাসাদ ও অনাচার দূরীকরণের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে এটা ঠিক, তিনি তাঁর জাতিকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করেছেন কিন্তু শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন নি এবং প্রতিশ্রুত দেশেও তাদেরকে পৌঁছাতে পারেন নি। তাঁর হাতে আত্মিক সংশোধনের সৌভাগ্য বনী ইসরাঈলের হয়নি। তারা বার বার নাফরমানী করেছিল। এমনকি এ অবস্থায়ই হযরত মূসা (আ.) মৃত্যু বরণ করলেন কিন্তু তাদের অবস্থা পূর্বের মতই রয়ে গেল। হযরত মসীহ্ (আ.) এর হাওয়ারীদের অবস্থা ইঞ্জিল থেকেই জানা যায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। আর ইহুদীরা, যাদের কাছে হযরত মসীহ্ (আ.) নবীরূপে এসেছিলেন, তারা যে কী পরিমাণ হেদায়ত তাঁর জীবদ্দশাতে লাভ করেছিল, এ বিষয়টিও কারও কাছে অজানা নয়। বরং হযরত মসীহ্ (আ.) এর নবুওয়তকে যদি এই মানদন্ডে বিচার করা হয়, তাহলে অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে বলতে হবে, এই মানদন্ডে তাঁর নবুওয়ত কোনভাবেই প্রমাণিত হবে না। * কেননা প্রথমত : নবীর জন্য জরুরী হচ্ছে, তিনি ঐ সময় আসবেন, যখন বাস্তবিক অর্থে সেই

টীকা ঃ

খ্রিষ্টানরা প্রায়শ্চিত্তবাদ নিয়ে খুবই গর্ববোধ করে। কিন্তু খৃষ্টীয় ইতিহাস বিশারদগণের এ বিষয়টি অজানা নয়, মসীহ্‌র আত্মহত্যার পূর্বে খ্রিষ্টানদের অল্প সংখ্যক খ্রিষ্টান নেক চালচলনের অধিকারী ছিল। কিন্তু অত্মহত্যার পর খ্রিষ্টানদের মন্দকর্মের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। এটা কি প্রায়শ্চিত্তবাদের প্রতিদান নয় যা আজ ইউরোপে বিদ্যমান রয়েছে। এদের চালচলনে ঐ লোকদের সাথে কি মিল রয়েছে, যারা প্রায়শ্চিত্তের পূর্বে মসীর সাথে চলাফেরা করতো?

জাতির, যাদের নিকট তাঁকে প্রেরণ করা হবে তাদের ধর্মীয় অবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত মসীহ্ ইহুদীদের প্রতি এমন কোনই অভিযোগ আরোপ করতে পারবেন না; যা থেকে প্রমাণিত হবে তারা তাদের বিশ্বাসকে পরিবর্তন করে নিয়েছে। অথবা তারা চোর, ব্যাভিচারী, জুয়ারী ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ে গেছে। অথবা তারা তওরাতকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন কিতাবের অনুসরণ করছে। বরং মসীহ্ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন পন্ডিতরা মূসার আসনে বসে আছেন। আর ইহুদীরাও নিজেদের মন্দ চালচলন ও মন্দ কর্মের কথা স্বীকার করে নি। আবার দ্বিতীয়ত: সত্যবাদী নবীর সত্যতার বড় দলিল হচ্ছে, তিনি পরিপূর্ণ সংশোধনের এক বড় দৃষ্টান্ত দেখাবেন। অতএব আমরা এ দৃষ্টান্ত হযরত মসীহ্র জীবনে যখন অনুসন্ধান করি এবং দেখতে চাই তিনি কোন ধরনের সংশোধন করেছেন, কত লক্ষ বা কত হাজার লোক তাঁর হাতে তওবা করেছে। তখন দৃষ্টিতে আসে-এ ছকটিও শূন্য পরে রয়েছে। হ্যাঁ, তবে বার জন হাওয়ারীকে দেখতে পাওয়া যায়! কিন্তু তাদের কর্মকান্ড যখন দেখা হয় তখন হৃদয় কেঁপে উঠে এবং আফসোস হয়, এ কেমন লোক! এমন নিষ্ঠার দাবী করে পরে এরূপ অপবিত্রতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলো! যার দৃষ্টান্ত জগতে আর নেই যে, ত্রিশ (৩০) টাকা নিয়ে এক সত্যবাদী নবী ও প্রিয় পথপ্রদর্শককে ঘাতকের হাতে তুলে দিল, সে কি হাওয়ারী বলার যোগ্য? পিতরের মত হাওয়ারীদের সর্দার হযরত মসীহ্র সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর লানত (অভিসম্পাত) দিয়েছে এবং কয়েকদিনের জীবনের জন্য নিজের নেতাকে সামনা সামনি গালি দিয়েছে, এটা কি তার জন্য সমীচীন ছিল? হযরত মসীহকে গ্রেফতারের সময় সমস্ত হাওয়ারীরা নিজ নিজ রাস্তা বেছে নিল, এক মুহূর্তের জন্যও ধৈর্য ধারণ করলো না, এটা কি তাদের জন্য উচিত হয়েছিল? যাদের প্রিয় নবীকে হত্যার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হওয়ার লক্ষণ এটাই কি ছিল, যা হাওয়ারীরা সেই সময় প্রদর্শন করেছিল? তার মৃত্যুর পর সৃষ্টির পূজারীরা কিচ্ছা কাহিনী বানাল আর তাঁকে আকাশে তুলে দিল। কিন্তু নিজেদের জীবনে তারা যে ঈমানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছে তা আজও ইঞ্জিলে বিদ্যমান রয়েছে। বস্তুত: এই দলিল যা নবুওয়ত ও রিসালতের মাহাত্ম্যের আলোকে এক সত্য নবীর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এটা হযরত মসীহ্র ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কুরআন তাঁর [মসীহ (আ.)] নবুওয়তের বর্ণনা যদি না করতো তাহলে তাঁকে সত্য নবীদের দলভুক্ত করার জন্য আমাদের নিকট কোন রাস্তাই খোলা ছিল না। যাঁর শিক্ষা হলো-আমি ইশ্বর ও ইশ্বরের পুত্র, ইবাদত ও

অনুগামিতার বাঁধন মুক্ত, যার যুক্তি দর্শন ও গূঢ়তত্ত্ব জ্ঞান শুধুমাত্র এটাই, লোকেরা আমার আত্মহত্যাতেই মুক্তি পাবে। এরকম লোককে এক মুহূর্তের জন্যও কি বলা যেতে পারে সে প্রজ্ঞা ও সৎ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত? কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! কুরআনের শিক্ষা আমাদেরকে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে। ইবনে মরিয়ম এর উপর এ সবই মিথ্যা অভিযোগ। ইঞ্জিলে ত্রিত্ববাদের নামনিশানাও নেই। এতে সাধারণ বাগধারা ইবনুল্লাহ ব্যবহৃত হয়েছে যেটা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আদম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত হাজারো লোকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এই সাধারণ শব্দই হযরত মসীহ্‌র জন্য ইঞ্জিলে এসেছে। পরে এটাকে বিকৃত করা হয়েছে। এমনকি এই শব্দের উপর ভিত্তি করে হযরত মসীহ্ ইশ্বরও হয়ে গেছেন। মসীহ্ কখনও ইশ্বরত্বের দাবী করেন নি আর কখনও আত্মাহত্যার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেন নি। যেমন খোদা তাআলা বলেছেন, যদি সে এমন করতো তাহলে সৎকর্মশীলদের তালিকা থেকে তার নাম বাদ যেত। এটা অত্যন্ত কষ্টে বিশ্বাস করতে হয়, এ রকম লজ্জাকর মিথ্যার ভিত্তি হাওয়ারীদের লাগামহীন চিন্তা ভাবনা সৃষ্টি করেছে। যদিওবা তাদের ব্যাপারে ইঞ্জিলে যা বর্ণিত হয়েছে তা সত্যি হয়। তারা স্থূলবুদ্ধি ও দ্রুত ভুলে নিপতিত মানুষ ছিল। কিন্তু আমরা এ বিষয়কে মেনে নিতে পারছি না, তারা এক নবীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়েও বৃথা চিন্তা-ভাবনার উপকরণ নিজেদের সাথে নিয়েই চলতো-ফিরতো। ইঞ্জিলের পাদটীকার প্রতি মনোনিবেশ করলে আসল বিষয় বুঝা যায়, এ সমস্ত চালাকী জনাব পৌলের। তিনি রাজনৈতিক চালবাজদের মত গভীর প্রতারণার মাধ্যমে কাজ করেছেন।

বস্তুত, কুরআন আমাদেরকে যে ইবনে মরিযমের সংবাদ দিয়েছে তিনি সেই অনাদি ও চিরন্তন হেদায়তের অনুসারী ছিলেন যা সূচনালগ্ন থেকেই নবী হযরত আদম (আ.) এর বংশধরের জন্য নির্ধারিত ছিল। এজন্য তাঁর নবুওয়তের ব্যাপারে কুরআনের দলিল প্রমাণই যথেষ্ট যদিও বাইবেলের বর্ণনায় তাঁর নবুওয়তে কতই না সন্দেহ ও মন্দ ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে!

والسلام على من اتبع الهدى

(যারা হেদায়তের অনুসরণ করে তাদের উপর শান্তি বর্ধিত হোক)

লেখক
খাকসার
গোলাম আহমদ।

Noorul Qur'an (1st Part)

(The light of the Holy Qur'an)

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), The Promised Messiah and Mahdi wanted to produce a magazine to be published quarterly. "Noorul Qur'an" was the name given to that magazine. The first issue was published in June 1895 and was meant to be for June, July and August.

The first issue starts with arguments of the excellence of the Holy Qur'an and calls upon the followers of other religions to prove their own scriptures to be from God.

As for the Holy Qur'an having been revealed by God to the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, being a true prophet, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmed (as) cites various arguments with verses of the Holy Qur'an and compares all his points with what the followers of other religions say about their own scriptures and their own prophets. He also takes up the question of salvation and explains the teachings of Islam in this respectd,

While comparing it with what Christianity teaches or is said to be teaching about salvation and forgiveness of sins, he also asserts that Trinity is not mentioned in the Gospels and therefore it could not be rightly called a teaching of the true Christianity.

Noorul Qur'an (1st Part)

by **Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
The Promised Messiah and Imam Mahdi [as]

translated into bengali by
Maulana Shah Muhammad Nurul Amin

published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka

ISBN 978-984-991-014-5

978 984 991 014 5